বিশ্বভারত গ্রন্থমালা

-১-

অরবিন্দ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ

বরদা এজেন্সী,
৬৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, আমার অনুরোধে শ্রীঅরবিন্দের এই জীবনচরিতখানা লিখিয়া দেন। কিছুদিন পরে আমি ইহা মুদ্রণ জন্য ছাপাখানায় পাঠাইয়া দেই। কিন্তু ছাপা আরম্ভ হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্যানুরোধে ধীরেন্দ্রবাবু কলিকাতা পরিত্যাগ করেন। তখন সম্পাদনার কার্য্য লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলাম, কারণ তিনি কলিকাতার বাহিরে থাকিয়া এ-ঝঞ্ঝাট নিজ হাতে লইলেন না, আমারই দুর্ব্বল হস্তে সে-গুরুভার অর্পণ করিলেন। সে-গুরুদায়িত্ব আমি অবসর মত ধীরে ধীরে সম্পাদন করিয়াছি; কারণ প্রয়োজন বোধে বহুস্থান পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করিতে হইয়াছে। এ-জন্য ও অন্যান্য কারণে পুস্তক প্রকাশে এত বিলম্ব হইয়া গেল।

বলা বাহুল্য, ধীরেন্দ্রবাবু স্বয়ং সম্পাদনার কার্য্য করিতে পারিলে কাজটি অধিকতর ভ্রম-প্রমাদশূন্য ও সুসম্পাদিত হইত। যাহা হউক, সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য এখন আমিই প্রধানতঃ দায়ী; সে-জন্য সুধী পাঠকবর্গের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ভুল-ত্রুটি প্রদর্শন করিলে বাধিত হইব এবং পরবর্ত্তী সংস্করণে সেগুলি সংশোধন করিতে প্রয়াস পাইব। ইতি—

কলিকাতা,
১০ই ফাল্গুন, ১৩৪১

শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী

You have the Word and we are waiting to accept it from you. India will speak through your voice to the world, 'Hearken to me.'

—*Rabindranath*

'Here comes Aurobindo Ghose, the completest synthesis that has been realised to this day, of the genius of Asia and of the genius of Europe. He believes humanity is going to enlarge its domain by the acquisition of a new knowledge, new powers, new capacities, which will lead to as great a revolution in human life as did the physical science in the 19th century.

—*Romain Rolland*

সূচি

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

শ্রীঅরবিন্দ

পূর্ব্বপুরুষ

মানুষের চরিত্রগঠনে পরিবার, সমাজ, কালের প্রভাব প্রভূত পরিমাণে কার্য্য করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার শক্তি কয়জন লোকের থাকে? শৈশবে একটি জীবনের কি সুন্দর সম্ভাবনাই আশা করা হইয়াছিল, কিন্তু অবস্থার বিপর্য্যয়ে সে আশা ফলবতী হ নাই, ইহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল নহে। আবার এমন মহাপুরুষ দেখা যায়, যিনি কাল ও অবস্থার বাধা অতিক্রম করিয়া সহজেই নিজ মহত্বের সৌরভ দিগ্বিদিকে বিস্তার করেন।

যাহা হউক, স্বীকার করিতেই হইবে যে, পরিবার, সমাজ ও কালের প্রভাব মানুষের জীবনগঠনে অনেকদূর পর্য্যন্ত সহায়তা করে। পিতামাতা, পূর্ব্বপুরুষ ও পরিবারের একটা চিত্র মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হওয়া স্বাভাবিক। অরবিন্দের জীবনগঠনে বাংলার নবযুগের অন্যতম প্রবর্ত্তক ঋষিপ্রতিম রাজনারায়ণ বসুর সাধুজীবন অলক্ষিতে অনেক সহায়তা করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় অরবিন্দের মাতামহ অরবিন্দের পিতার নাম ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ। তিনি মিঃ কে, ডি ঘোষ নামেই খ্যাত ছিলেন। পিতা ও মাতামহের জীবনের প্রভাব অরবিন্দের জীবনে কি পরিমাণে কার্য্য করিয়াছে তাহা আলোচনার যোগ্য।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর রাজনারায়ণ ২৪ পরগণার বোড়াল নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পিতার একমাত্র পুত্র। সেকালের শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারেই শৈশবে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি প্রথমে কলিকাতাস্থ ডেভিড হেয়ার স্কুলে ভর্তি হ'ন। সেখানে মহামতি ডেভিড হেয়ার ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য সুযোগ্য অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে তিনি ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ের তর্কসভায় তিনি "Whether Science is preferable to Literature" (বিজ্ঞান কি সাহিত্য হইতে অধিকতর সমাদরণীয়?) নামে একটি স্বরচিত ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধ শুনিয়া হেয়ার ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ উচ্চ প্রশংসা করেন। ইহার কিছুকাল পরে রাজনারায়ণ 'ক্লাব ম্যাগাজিন' (Club Magazine) নামে একখানি ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশ করেন।

হেয়ার স্কুল হইতে রাজনারায়ণ হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। সেখানে কৃতিত্বের সহিত একটি বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ৩০৲ টাকার একটি বৃত্তি লাভ করেন। ইহার পর অল্পকালের মধ্যেই রাজনারায়ণ তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করেন।

তখনকার কালে ইংরেজ অধ্যাপক ও ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে সুন্দর সদ্ভাব দেখা যাইত। রাজনারায়ণ ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন ও মিঃ জেম্‌স্ কার নামে হিন্দু কলেজের দুইটি সুপণ্ডিত অধ্যাপকের সহায়তা ও সান্নিধ্য লাভ করিয়া পরম উপকৃত হ'ন। এই সব অধ্যাপকের পাণ্ডিত্য রাজনারায়ণ ও তাঁহার সহপাঠীদের উপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্যারীচাঁদ সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই ভবিষ্যৎ জীবনে নানা ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

বিদেশীয় অধ্যাপকগণ তখন এত ঘনিষ্ঠভাবে ছাত্রদের সঙ্গে মিশিতেন যে, শুধু জ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়, ধর্ম্মজীবনেও তাঁহাদের আদান প্রদান চলিত। এই সব অধ্যাপকের ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে উদার মত সুযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ ভাবে সংক্রামিত হইত। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রথম আলোকপাতে তখন এদেশীয় ছাত্রদের চক্ষু এত ধাঁধিয়া গিয়াছিল যে, তাঁহারা অনেকেই মদ্যপান ও গোমাংস ভক্ষণকে সভ্যতার একটি অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। মদ্যপান ও গোমাংস ভক্ষণ করিয়া দেশে আলোক আনয়ন করিবার স্থান ছিল গোলদীঘি। ইহার প্রভাব হইতে প্রথমে রাজনারায়ণও উদ্ধার পান নাই। তিনি প্রথমে নাস্তিক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা ও স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তিনি বেদান্ত-ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করেন।

পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইহাতে তাঁহার নাস্তিক বন্ধুরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হন, কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসায় তিনি ক্রমশঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইতে লাগিলেন। প্রতি-দিন সন্ধ্যায় মহর্ষি গাড়ী করিয়া তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া যাইতেন ও সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির বিষয়ে আলোচনা করিতেন। মহর্ষিদেবের গৃহে তখন প্রায়ই দেশের খ্যাতনামা লোকদের সমাগম হইত। সেখানে রাজনারায়ণের সহিত অনেক সময়ই দেশভক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামাচরণ সরকার প্রভৃতি গণ্যমান্য লোকদের দেখাশুনা হইত।

সেই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহ বাংলাদেশের সাহিত্য, ধর্ম্ম ও দেশপ্রেমের মিলনভূমি ছিল। দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণের অসাধারণ

প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে উপনিষদ্ অনুবাদ করিবার ভার দেন। ক্রমে রাজনারায়ণ বাংলায় বক্তৃতা দিবার ক্ষমতায় পারদর্শিতা লাভ করেন। তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতাগুলি পাঠ করিলে গভীর ভগবদ্-প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। পরে তিনি প্রায় পনর' বৎসর কাল মেদিনীপুরে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন ও সেখানকায় ব্রাহ্মসমাজে নূতন প্রাণ দান করেন।

প্রথম ইংরেজী শিক্ষার সমাগমে উদারতার নাম লইয়া দেশে যে উচ্ছৃঙ্খলতার, যে দেশ-বিরাগের প্রবল বন্যা আসে, তখনকার ব্রাহ্মসমাজ তাহা হইতে দেশকে অনেকাংশে রক্ষা করে। শিক্ষিত যুবকেরা তৎকালীন অন্ধ কুসংস্কারগুলিকেই হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘোষণা করিল যে, হিন্দুর বেদ, উপনিষদের ধর্ম্ম অতি উদার এবং তাহার মধ্যেই এক নিরাকার ব্রহ্মের মহিমা প্রচারিত হইয়াছে।

এই সময়ে রাজনারায়ণ দেশে দেশপ্রীতির উন্মেষের জন্য সবিশেষ প্রয়াস পান ও মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেন। ব্রাহ্মসমাজের একটি দল উদারতার নামে পাশ্চাত্যের মোহ হইতে উদ্ধার পান নাই; শত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও রাজনারায়ণ এই দলের মতবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই রূপান্তর, তাহা পশ্চিমের ধার করা জিনিষ নয়। তিনি পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু তিনিই প্রকৃত হিন্দু ছিলেন। তাঁহার হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা তদানীন্তন কোন হিন্দু অপেক্ষা কম ছিল না। হিন্দু অতি ঘৃণিত জীব ও হীন, পাশ্চাত্য সভ্যতাই আমাদের মুক্তির উপায়—এই আদর্শকে রাজনারায়ণ একান্তমনে ঘৃণা করিতেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে

ধারাবাহিক বক্তৃতা দান করেন। তাঁহার হিন্দুধর্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও স্বদেশপ্রেম আশৈশব পাশ্চাত্য সভ্যতায় লালিতপালিত অরবিন্দের মধ্যে মূর্ত্ত দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই।

শেষ জীবনে রাজনারায়ণ "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থখানি সর্ব্বজনপ্রশংসিত হয়। বর্ত্তমান দেশ-প্রেমের উন্মেষের মূলে রাজনারায়ণের এই সকল প্রয়াসের যথেষ্ট কার্য্য-কারিতা আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রকৃতপক্ষে এই দেশ-প্রেমেরই বীজ অরবিন্দের মধ্যে সঞ্জীবিত হয়। এক-দিকে নূতন সভ্যতার প্রখর আলোকপাতে চারিদিক উজ্জ্বল করিয়া দেশীয় সভ্যতাকে নিষ্প্রভ করিবার চেষ্টা, অন্যদিকে হিন্দুধর্ম কুসংস্কারাচ্ছন্ন নহে, ইহা বেদ-উপনিষদের উদার ধর্ম—এই দুইটি প্রবল ধারার মধ্যে রাজ-নারায়ণের প্রতিভা উদ্বোধিত এবং সেই উদ্বুদ্ধ প্রতিভারই আদর্শ অরবিন্দের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের স্বদেশ-প্রেমের কিঞ্চিৎ পরিচয় তাঁহার বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। ইংরেজ কবি মিল্টন স্বজাতির উন্নতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করিয়া বৃদ্ধ হিন্দু বলিতেছেন —"আমিও সেইরূপ হিন্দুজাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি, আমি দেখিতেছি, আবার আমার সম্মুখে মহাবলপরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে; হিন্দুজাতির কীর্ত্তি, হিন্দু-জাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে। এই আশা-

শ্রীঅরবিন্দ.

পূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ করিয়া আমি অদ্য বক্তৃতা সমাপন করিতেছি—

মিলে সব ভারত-সন্তান,
একতান মনঃপ্রাণ ;
গাও ভারতের যশোগান।

ভারত ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান ?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী স্রোতস্বতী পুণ্যবতী;
শত খনি—রত্নের নিধান।

হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয়, কি ভয় ?
গাও ভারতের জয়।

রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারত-ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা ?
শর্ম্মিষ্ঠা, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত-ললনা।

হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,

শ্রীঅরবিন্দ

গাও ভারতের জয়,
কি ভয়, কি ভয়?
গাও ভারতের জয়।

বশিষ্ঠ, গৌতম, অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র, ভৃগু তপোধন।
বাল্মীকি, বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস
কবিকুল ভারত-ভূষণ।

হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয়, কি ভয়?
গাও ভারতের জয়।

কেন ডর ভীরু? কর সাহস আশ্রয়,
যতোধর্ম্ম স্ততো জয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?

হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয়, কি ভয়?
গাও ভারতের জয়।"*

* এই সুপ্রসিদ্ধ জাতীয় সঙ্গীতটি ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত। ইহার অনুদ্ধৃত অংশ এইরূপ—

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির?
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি।

হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয়, কি ভয়?
গাও ভারতের জয়।

ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথুরাজ আদি বীরগণ?
ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু, দুষ্টের দমন।

হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয়, কি ভয়?
গাও ভারতের জয়।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের এই অভয়বাণী তখন উন্মার্গগামী দেশবাসীকে পথের সন্ধান নির্দ্দেশ করে। আমাদের কিছু নাই, আমরা নিঃসম্বল, আমরা অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন—এই কথা শুনিয়া শুনিয়া দেশবাসীর মন তখন নৈরাশ্যের অন্ধকারে মগ্ন ছিল। সেই সময়ে দেশবাসীকে সাহস আশ্রয় করিতে উপদেশ দেওয়া ও তাঁহাদের মনের মধ্যে আত্ম-গরিমার ভাব জাগাইয়া তোলার কাজ যে সকল মহাপুরুষ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের স্থান নিম্নে নহে। ইহার অল্পকাল পরেই বাংলাদেশে যে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, সেই আন্দোলনকে এই অভয়বাণী অনুপ্রেরণা দিয়াছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। এই সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তির দেশপ্রেম আজিকার জাতীয় মহাসভার (কংগ্রেস) উদ্বোধনের সময়ে পরোক্ষভাবে যে কি পরিমাণ সহায়তা করিয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাঁহারা একদিকে যেমন সকল প্রকার কুসংস্কার হইতে মুক্ত ছিলেন, অন্যদিকে আবার তেমনি স্বদেশের জ্ঞান, ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্প—সকল প্রকার উন্নতিকল্পে মনঃপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের তুষার-শুভ্র শ্মশ্রু ও কেশ মণ্ডিত সদাপ্রফুল্ল মুখখানি দেখিলে ও তাঁহার বন্ধু দ্বিজেন্দ্রনাথেরই ন্যায় অমায়িক, মনখোলা উচ্চহাস্য শুনিলে তাঁহাকে নব যুগের নব-জাতীয়তার অন্যতম ঋষি বলিয়াই মনে হইত। প্রকৃতপক্ষেও "স্বদেশ-আত্মার বাণী-মূর্ত্তি" অরবিন্দের মাতামহ বলিয়া পরবর্ত্তীকালে তিনি ভারতের জাতীয়তার মাতামহ (Grandfather of Indian Nationalism) নামে অভিহিত হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অরবিন্দের পিতা মিঃ কে, ডি, ঘোষ নামে

খ্যাত ছিলেন। তিনি যখন অরবিন্দের মাতাকে বিবাহ করেন, তখনই চিকিৎসা-ব্যবসায়ে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। স্বভাবের মাধুর্য্য, কোমল চিত্তবৃত্তি, ভদ্র ব্যবহার প্রভৃতি সদ্‌গুণে তাঁহার প্রতি সকলেই আকৃষ্ট হইত।

মিঃ কে, ডি, ঘোষ আই-এম্‌-এস্‌ পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। রাজনারায়ণের বহু উপদেশ সত্ত্বেও কৃষ্ণধন পুরাদস্তুর সাহেব হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু আচার-ব্যবহারে সাহেবিয়ানা থাকিলেও তাঁহার মনের বাঙালীসুলভ কোমলতা কিছুমাত্র নষ্ট হয় নাই। দুঃখীর দুঃখ, দরিদ্রের দৈন্য দূর করিতে যাইয়া অনেক সময় তিনি নিঃসম্বল হইয়া পড়িতেন। এই দয়ামায়ার জন্য আজও যশোহর ও খুলনায় তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার তৎপ্রণীত "আমার আত্মকথা"য় পিতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বাবা প্রথমে ছিলেন রংপুরের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন। যে বছর কেশব সেন, বি দে প্রভৃতি বড় বড় একদল বাঙালী জাহাজে চড়ে বিলেতে যান সেই বছর তাঁদের সঙ্গে গেছিলেন এই রংপুরের ডাক্তারটি, এবাডিনের য়ুনিভারসিটিতে তিনি এম্‌, ডি পাশ করে হয়ে এলেন পূরোদস্তর সিভিল সার্জ্জন। * * * পূরো মাত্রায় সাহেব ডাক্তার হয়ে ফিরে এসে কিছুদিন তিনি ভাগলপুরের সিভিল সার্জ্জন হন, তার পরে আসেন রংপুরে। এখানে তাঁর অনেক বৎসর কাটে। রংপুরে তাঁর এত ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা হয়েছিল যে একটি সমগ্র জেলার এই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতাটিকে জেলার সর্ব্বময় অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হতে দেখে গভর্ণমেণ্ট ভয় পেয়ে যান এবং তাঁকে কিছুদিনের জন্যে ভাগলপুরে বদলী করে তার পর খুলনায় সিভিল সার্জ্জন করে পাঠান।

শ্যামবর্ণ, আকর্ণবিস্তৃত চোখ, সৌম্যদর্শন এই মানুষটি শীঘ্রই খুলনারও হয়ে উঠলেন প্রাণ। সেখানকার পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, স্কুল, জমিদার, আমলা, প্রজা কারুর ডাক্তার কে, ডি, ঘোষকে বিনা একদিনও চলতো না। ম্যালেরিয়া-প্রধান খুলনাকে ম্যালেরিয়াশূন্য করে হাসপাতাল, স্কুল, মিউনিসিপালিটি সমস্ত নিজের হাতে গড়ে এই মুকুটহীন রাজা বহু বৎসর খুলনায় রাজত্ব করেছিলেন। আজও খুলনা বা রংপুরবাসী তাঁকে ও তাঁর কীর্ত্তিকলাপকে ভোলে নি।"

*　　　*　　　*

"বাবার চেহারা এখনও আমার মনে আছে। শ্যামবর্ণ, বড় বড় ভাসা চোখ, মাইকেল মধুসূদনের মত মুখাকৃতি, নাতিদীর্ঘ ঋজু দৃঢ়পেশী শরীর, নতুন গুড়ের মত মিষ্টি স্বভাব, সদাপ্রসন্ন মূর্ত্তি, অথচ একরোখা শক্তিমান পুরুষ। ডাক্তারীতে তাঁর যশ ছিল প্রচুর, ঠাকুর দেবতার কাছে মানতের মত বেশী রোগী তাঁর কাছে এসে জীবন ও পরমায়ু ভিক্ষা করতো। টাকা তিনি উপার্জ্জন করতেন প্রচুর, আর ব্যয়ও করতেন অপরিমিত ভাবে। তাঁর দয়া ও মমতার কাহিনী খুলনায় এখনও কিম্বদন্তির মত মানুষের মুখে মুখে রয়েছে।"

•　　　•　　　•

"বাবার স্বভাব ছিল বেহিসেবী খরচে, টাকা তাঁর হাতে ভোজবাজীর সৃষ্ট জিনিসের মত দেখতে না দেখতে উড়ে যেত। দয়ার বশে যে নারীর অধিক অসহায় ও দুর্ব্বল, বন্ধুর জন্যে যে এক কথায় সর্ব্বস্ব দিয়ে দিতে পারে, পরিচিত অপরিচিতের যে মানুষ স্বভাবতঃ পরমাশ্রয়, সে মানুষ অমিতব্যয়ী হলে যা' হয় এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। ছেলে তিনটিকে বিলাতে শিক্ষার জন্যে রেখে এসে বাবা কিছু দিন নিয়মিত টাকা

পাঠালেন, তার পর সেদিকেও বিশৃঙ্খলা এল। এই রকম মানুষ দুনিয়ায় অনেক আছে যারা দুঃস্থের জন্যে দানসত্র খুলে বসে আছে, আর তার নিজের পরমাত্মীয় উপবাসে মরছে।"

অরবিন্দের মাতৃদেবী স্বর্ণলতা রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। মাতৃক্রোড়ে অরবিন্দ বাল্যে তাঁহার মাতামহের ভগবদ্‌ভক্তি ও দেশপ্রেমে অলক্ষিতে নিশ্চয়ই উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। আর পিতা কৃষ্ণধনের স্বভাবের মাধুর্য্য, বিনয়, সৌজন্য ও দরিদ্রদের প্রতি একান্ত সহানুভূতি —এই সকল সদ্‌গুণও অরবিন্দের মধ্যে শৈশবেই পরিলক্ষিত হইত।

২

শৈশব ও যৌবন

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অগাষ্ট তারিখ কলিকাতা মহানগরীতে অরবিন্দের জন্ম হয়। * শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ ঘোষ ও ৺মনোমোহন ঘোষ অরবিন্দের দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বোমার যুগের শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর নাম শ্রীযুক্তা সরোজিনী ঘোষ। অরবিন্দের পিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার পুত্রদের সর্ব্বোচ্চ ইংরেজী শিক্ষা দিবেন। পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিতেই অরবিন্দ দার্জ্জিলিং-এর সেণ্ট পল্‌স্ স্কুলে (St. Paul's School) অধ্যয়নের জন্য প্রেরিত হন। সেই বয়সেই ইংরেজ অধ্যাপকগণ তাঁহার প্রতিভার কিঞ্চিৎ আভাস পান। বালক অরবিন্দ বিদ্যালয়ে সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠেন। এইরূপে অল্প-বয়স হইতেই পাশ্চাত্য সভ্যতার পূর্ণ আবেষ্টন ও আবহাওয়ার মধ্যে অরবিন্দের জীবন অতিবাহিত হইতে থাকে। সেণ্ট পল্‌স্ স্কুলে দুই বৎসর কাল অধ্যয়নের পর অরবিন্দকে ইংলণ্ডে যাইতে হয়। তাঁহার বয়স তখন মাত্র সাত বৎসর। কৃষ্ণধন স্ত্রীপুত্রদের শিক্ষার জন্য সপরিবারে ইংলণ্ডে যান। ১৮৭৯ সালের অগাষ্ট মাসে তিনি

---

* ঠিক এই বৎসরই আবার ইটালীদেশের নবযুগের প্রবর্ত্তক ও জাতীয়তার ঋষি জোসেফ্ ম্যাটসিনি (Joseph Mazzini) দেহত্যাগ করেন।

তাঁহাদের বিলাতে রাখিয়া একাকী দেশে ফিরিয়া আসেন। সেখানে কিছুদিন পরেই অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমারের জন্ম হয়। তাহার তিন মাস পরে—১৮৮০ সালের মার্চ মাসে—অরবিন্দের মাতা শিশু বারীন্দ্র ও কন্যা সরোজিনীকে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। প্রথম সন্তানের জন্মের পর হইতেই তাহার ভিতর ক্রমশঃ পাগলামির ভাব দেখা যাইতেছিল—শেষ সন্তান বারীন্দ্রকুমারের জন্মের কিছু দিন পরে তিনি পূর্ণমাত্রায় পাগল হন। পরবর্তী জীবনে অনেক সময় অরবিন্দ নিজেকে 'পাগলী মায়ের পাগল ছেলে' বলিয়া আমোদ অনুভব করিতেন। কিন্তু মায়ের উপর তাঁহার ভক্তি ছিল অসাধারণ—সে ভক্তি-শ্রদ্ধার কোন দিনই, কিছুতেই কমতি হয় নাই।

বিনয়ভূষণ, মনোমোহন ও অরবিন্দ ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। রংপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট গ্লেজিয়ার (Glazier) সাহেব কৃষ্ণধনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। এই গ্লেজিয়ার সাহেবের আত্মীয় পাদ্রী ড্রুইড সাহেবের পরিবারে ম্যাঞ্চেষ্টার সহরে অরবিন্দেরা তিন ভাই থাকিতেন। ড্রুইডদের আত্মীয় অক্রয়েড (Akroyd) পরিবারের সঙ্গে কৃষ্ণধনের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। এইজন্য বিলাতে অরবিন্দের নাম হইয়াছিল অরবিন্দ অক্রয়েড ঘোষ। এমন কি অরবিন্দ যখন বিলাত হইতে বরোদায় আসেন, তখনও তাঁহার পত্রাদি A. A. Ghosh—অর্থাৎ অরবিন্দ অক্রয়েড ঘোষ—এই নামে আসিত। পরে অরবিন্দ স্বয়ং এই বিলাতী নামটি ত্যাগ করেন।

প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর কাল ইংলণ্ডে থাকিয়া অরবিন্দ শিক্ষালাভ করেন। প্রথমে বৎসর পাঁচেক ম্যাঞ্চেষ্টারের এক 'গ্রামার' (Grammar) স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া পরে লণ্ডনের সেণ্ট পল্‌স্ বিদ্যালয়ে (St. Paul's

School) ভর্তি হ'ন। এখানেও প্রতিভা ও চরিত্রগুণে তিনি শীঘ্রই সকলের প্রিয় হইয়া উঠেন। সেখান হইতে ৪০ পাউণ্ড বৃত্তি পাইয়া তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিং্স কলেজে (King's College) প্রবেশলাভ করেন। এই সময়ে তিনি সিভিল সার্ভিস (Civil Service) পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত হইতে থাকেন। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি নিজ মাতৃভাষা বাংলা জানিতেন না। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে সামান্য বাংলা শিখিতে হইল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি এই পরীক্ষা দেন; তখন তাঁহার বয়স মাত্র আঠারো বৎসর। এই পরীক্ষায় ল্যাটিন ও গ্রীক্ ভাষায় 'রেকর্ড' (Record) নম্বর সহ প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মোটের উপর গুণানুসারে তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন, কিন্তু সামান্য অশ্বারোহণের পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত সিভিল সার্ভিসে প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই। এই অশ্বারোহণে অকৃতকার্য্য হওয়া সম্বন্ধে নানারূপ জনমত শোনা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, অশ্বারোহণের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অরবিন্দ নিজের ঘর হইতে বাহির হইবার সময় কোন এক অলৌকিক শক্তি যেন তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল এবং একরূপ চলৎশক্তিহীন করিয়া তুলিয়াছিল। এই অলৌকিক শক্তিকে অধুনাশিক্ষিত অনেকে হয়ত বিশ্বাস না করিতে পারেন, কিন্তু মহাপুরুষদের জীবন আলোচনা করিলে এমন অনেক অপ্রাকৃত ঘটনার বিষয় জানিতে পারা যায়, যাহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা অসম্ভব বা সুকঠিন। আবার অরবিন্দের ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার "আমার আত্মকথা"য় লিখিয়াছেন—"সেখানে (লণ্ডনে) প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের আলোচনা-সভা ছিল, তার নাম ছিল 'মজলিস্'। সেই সভায় গরম গরম রাজনৈতিক বক্তৃতা দেওয়ায় শ্রীঅরবিন্দ সেই বয়সেই গভর্ণ-মেণ্টের সুনজরে পড়েন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছিলেন সেখানে

শ্রীঅরবিন্দের সমসাময়িক। I. C. S. পরীক্ষায় বেশ সম্মানের সঙ্গে পাশ করেও তুচ্ছ ঘোড়ায় চড়ায় যে তাঁকে অকৃতকার্য্য বিবেচনা করা হ'লো তার কারণ খুবই সম্ভব গভর্ণমেণ্টের ঐ সুনজর, সেই সময়ে এই নিয়ে ভারতে সংবাদপত্রে খুব আন্দোলন হয়েছিল।"

যাহা হউক, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে অরবিন্দ দেশে আসিয়া হয় ত একটি জিলার হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া বসিতে পারিতেন, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে দেশের হয় ত ত্যাগী, ঋষি অরবিন্দকে লাভ করিবার সুযোগ মিলিত না, এইরূপ সন্দেহ করিবার বিশেষ হেতু নাই। কারণ, ইহার পরেও অরবিন্দ সাংসারিক উন্নতিলাভের যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছিলেন, কিন্তু চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সেই তাঁহার মনে যে দেশপ্রেমের ভাব আত্মপ্রকাশ করে বিলাতের কর্ম্মবহুলতা ও বিলাসের আড়ম্বরের মধ্যেও তাঁহার সে ভাব নির্ব্বাপিত হয় নাই, বরং তাহা উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভই করিতে থাকে।

তিনি পুনরায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে আরম্ভ করেন, এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ক্লাসিক্স্ (Classics) * ট্রাইপস্ (Tripos—সম্মান) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হ'ন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বিলাতে তাঁহাদের অত্যন্ত অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হইতেছিল। তাঁহারা তিন ভাই যথাসময়ে পিতার নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য পাইতেন না। পিতা কৃষ্ণধন অর্থ উপার্জ্জন করিতেন প্রচুর, কিন্তু তাঁহার ব্যয়েরও কোন হিসাব ছিল না। এই তিন ভাই-এর ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য বার্ষিক তিন শত ষাট পাউণ্ড পাঠাইবার কথা ছিল,

* গ্রীক্ ও ল্যাটিন ভাষা।

কিন্তু এক বৎসর তিনি মাত্র একশত পাউণ্ড পাঠাইলেন। অনেক সময় তাঁহাদের বাধ্য হইয়া ঋণ করিতে হইত। এমন কি অনেক দিন অরবিন্দ একরূপ অনাহারেই দিন কাটাইয়াছেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পিতা কৃষ্ণধনও পরলোক গমন করেন। সুতরাং শেষে কিছুদিন কলেজের বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়াই অরবিন্দকে খরচাদি নির্ব্বাহ করিতে হইত।

বিলাতে অরবিন্দ সাত বৎসর বয়স হইতে প্রায় একুশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছিলেন। যে সময় মানুষের জীবনে চিত্তবৃত্তি কোমল থাকে এবং সহজেই নূতন নূতন আদর্শের ছাপ পড়ে, সেই সময়েই অরবিন্দ বিদেশে সম্পূর্ণ বিদেশীয় আবহাওয়ার মধ্যে দিন কাটাইয়াছেন। কিন্তু চারি দিকের বিলাসের আড়ম্বর, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল তরঙ্গ তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে নাই।

প্রায়ই দেখা যায়, দুই এক বৎসর বিলাতে থাকিয়া ফিরিয়া আসিলেই অনেক যুবকের সমস্ত জীবনের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পশ্চিমের উপকরণ-বহুল জীবনের আড়ম্বরের হাত হইতে বহু দূরে থাকিয়াও অনেকে তাহার হাত হইতে রক্ষা পান না, সুতরাং যে সকল কোমলমতি যুবক একেবারে সেই বিলাসের আবর্ত্তের মধ্যে গিয়া পড়েন, তাঁহাদের স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তনে বিস্ময়ের বিশেষ কোন কারণও নাই। কিন্তু অরবিন্দ পশ্চিমের বাহ্য চাকচিক্যেই মুগ্ধ হ'ন নাই—তিনি তাহার প্রাণের চিন্তাধারার যথার্থ সন্ধান পাইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞানের ভাণ্ডারে রত্ন আহরণ করিতেই তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত ছিল, অন্যবিধ মোহ তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎসে

উপনীত হইয়াছিলেন; সুতরাং চতুর্দ্দশ বৎসর ইংলণ্ড-প্রবাসেও তিনি পুরাদস্তুর সাহেবে পরিণত হ'ন নাই।

যাহা হউক, প্রবাসী ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে অরবিন্দই প্রথমে দেশে ফিরেন। বারীন্দ্রকুমার "আমার আত্মকথা"য় লিখিয়াছেন,—"ভারতে জনপ্রিয় সার হেনরী কটন ছিলেন দাদাবাবু রাজনারায়ণ বসুর বিশেষ বন্ধু। বড়দা' (বিনয়ভূষণ) তাঁর ছেলে জেমস্ কটনের কাছে শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে যান; জেমস্ কটন তাঁকে গায়কবাড়ের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়ায় গায়কবাড় তাঁকে প্রাইভেট সেক্রেটারী করে' দেশে নিয়ে আসেন। তার পরে দেশে আসেন বড়দা' ১৮৯৩ সালের এপ্রিল মাসে। কুচবেহার মহারাজ-কুমারের শিক্ষক হবার পর আজমিরে গিয়ে ১৫০০ টাকা ঋণ করে বড়দা' যখন টাকা পাঠালেন তখন মেজদা' মনোমোহন দেশে আসতে পারলেন। এইখানে পড়লো তাঁদের বিলাতের শিক্ষা-জীবনের যবনিকা।

"I. C. S পরীক্ষায় অরবিন্দ অকৃতকার্য্য হবার পর বাবা বড় নিরাশ হ'য়ে পড়েন, তাঁর বড় সাধ ছিল অরবিন্দ I. C. S হয়ে এসে তাঁর মুখোজ্জ্বল করবেন। আজ বাবা বেঁচে থাকলে তাঁর দেশ-বিশ্রুত সন্তানের পৃথিবীব্যাপী যশ কি ভাবে নিতেন জানি নে।"

অরবিন্দের বড়দা' বিনয়ভূষণ দেশে আসিয়া কুচবিহার-রাজের অধীনে উচ্চবেতন রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার মেজদা' মনোমোহন বিলাতেই ইংরাজী কবিতা লিখিয়া সুকবি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। স্বদেশে ফিরিয়া তিনি সরকারী শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ-লাভ করিলেন।

ইংলণ্ডে চতুর্দ্দশ বৎসর থাকিয়া অরবিন্দ যে কেবল পাশ্চাত্য জ্ঞান আহরণ করেন, তাহা নহে, তিনি ইংরেজদের মনোভাব, তাঁহাদের

আচার-ব্যবহার রীতিনীতি, তাঁহাদের মহত্ব ও ক্ষুদ্রতা, কোথায় তাঁহাদের শক্তি ও সামর্থ্য এবং কোথায় তাঁহাদের দুর্ব্বলতা—সকলই পর্য্যবেক্ষণ করেন। ভবিষ্যৎ জীবনে কর্ম্মক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা তাঁহাকে অনেক সহায়তা করিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

৩

বরোদায় *

অরবিন্দ গায়কবাড়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী হইয়া যখন বরোদায় আসেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র একুশ বৎসর। প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে ও রাজস্ব বিভাগে কিছুদিন কাজ করিবার পর তিনি বরোদা কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং তৎপর তথাকার ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল বা সহকারী অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। তখন তাঁহার বেতন ছিল মাসিক ৭৫০্ টাকা। ইহা কোন প্রকারেই সিভিল সার্ভিস হইতে কম লাভজনক বা সম্মানপ্রদ ছিল না। এই সময়ে তিনি জ্ঞানচর্চ্চার মধ্যেই মগ্ন ছিলেন, ধীরস্থির ভাবে তিনি তখন জীবনের মহান্ আদর্শের পথ নির্ণয় করিতেছিলেন।

সাংসারিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা তখন সহজেই তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছিল। ছাত্রগণ তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিত। স্বয়ং গায়কবাড়ও তাঁহাকে দেবচরিত্র জ্ঞানে যথেষ্ট বিশ্বাস ও স্নেহ করিতেন। বরোদায় তিনি প্রায় বারো বৎসর কাল ছিলেন; আরও কিছুদিন সেখানে থাকিলে এবং ইচ্ছা করিলে তিনি ধীরে ধীরে উচ্চতর পদ লাভ করিয়া অনায়াসেই সাংসারিক জীবনে অধিকতর উন্নতি করিতে পারিতেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ।

* এই পরিচ্ছেদের উদ্ধৃত অংশগুলি শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত 'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ' হইতে গৃহীত।

বরোদায় অনেক উপার্জ্জন করিলেও তিনি নিতান্ত সাদাসিধে ভাবে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহাকে বাংলা শিখাইবার জন্য তখন সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায় বরোদায় ছিলেন। তাঁহার 'অরবিন্দ প্রসঙ্গ' নামক সুখপাঠ্য পুস্তিকায় অরবিন্দের বরোদাবাস সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারা যায়। অরবিন্দের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "...কে ভাবিয়াছিল যে, পায়ে শুঁড়ওয়ালা সেকেলে নাগড়া জুতা, পরিধানে আহমদাবাদের মিলের বিশ্রী পাড়ওয়ালা মোটা ধুতি, কাছার আধখানা খোলা, গায়ে আঁটা মেরজাই, মাথায় লম্বা লম্বা গ্রীবাবিলম্বিত বাবরীকাটা পাতলা চুল, মধ্যে চেরা সিঁথি, মুখে অল্প অল্প বসন্তের দাগ, চক্ষুতে কোমলতা-পূর্ণ স্বপ্নময় ভাব, শ্যামবর্ণ ক্ষীণদেহধারী এই যুবক ইংরাজী, ফরাসী, লাটিন, হিব্রু, গ্রীকের সজীব ফোয়ারা শ্রীমান্ অরবিন্দ ঘোষ! দেওঘরের পাহাড় দেখাইয়া যদি কেহ বলিত,—'ঐ হিমালয়', তাহা হইলেও বোধ হয়, ততদূর বিস্মিত ও হতাশ হইতাম না।—যাহা হউক, দুই একদিনের ব্যবহারেই বুঝিলাম, অরবিন্দের হৃদয়ে পৃথিবীর হীনতা ও কলুষতা নাই। তাঁহার হাসি শিশুর হাসির মত সরল, তরল ও সুকোমল। হৃদয়ের অটল সঙ্কল্প ওষ্ঠপ্রান্তে আত্ম-প্রকাশ করিলেও মানবের দুঃখে আত্মবিসর্জ্জনের দেবদুর্লভ আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন সে হৃদয়ে পার্থিব উচ্চাভিলাষের বা মনুষ্যসুলভ স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই।"

বরোদায় তিনি বহুঅর্থ উপার্জ্জন করিলেও মাসের শেষে তাঁহার হাতে প্রায় কিছুই থাকিত না। তাঁহাকে নানাস্থানে টাকা পাঠাইতে হইত। তা' ছাড়া পুস্তক ক্রয়েও তাঁহার অনেক অর্থ ব্যয় হইত। বোম্বাইয়ের পুস্তক ব্যবসায়ী আত্মারাম রাধাবাঈ সেগুন ও থ্যাকার কোম্পানীর নিকট হইতে তিনি প্রতি মাসে বহু নূতন নূতন পুস্তক ক্রয় করিতেন। মাঝে

মাঝেই তাঁহার নামে 'রেলওয়ে পার্শেলে' রাশি রাশি পুস্তক আসিত, আর তিনি ক্ষুধাতুর বালকের ন্যায় অল্পকালের মধ্যেই তাহা নিঃশেষ করিয়া নূতন গ্রন্থের অন্বেষণ করিতেন।

সদ্য বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইলেও অরবিন্দ তখনই যেন মহা-ত্যাগের জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। অপরের অভাবকে তিনি যে নিজের অভাবের অপেক্ষা গুরুতর মনে করিতেন, তাহা বরোদায় অবস্থান কালের সামান্য একটি ঘটনা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই প্রসঙ্গে দীনেন্দ্রকুমার লিখিয়াছেন—

"একদিন অরবিন্দ তাঁহার মাকে কি ভগিনীকে—ঠিক মনে নাই—টাকা পাঠাইবার জন্য মনিঅর্ডারের 'ফরম' পূরণ করিতেছিলেন। তাহার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই আমি বাড়ীতে টাকা পাঠাইব মনে করিতেছিলাম, কিন্তু অরবিন্দের হাতে যথেষ্ট টাকা আছে কিনা সন্দেহে তাঁহার নিকট টাকা চাহিতে সঙ্কোচ হইতেছিল। তিনি মনিঅর্ডার করিতেছেন দেখিয়া আমার মনে হইল, এই সুযোগে কিছু টাকা চাহিয়া লইয়া আমিও বাড়ীতে পাঠাই। টাকা চাহিলাম। অরবিন্দ হাসিয়া বাক্সের ভিতর হইতে তাঁহার হাতব্যাগটি বাহির করিলেন; ব্যাগে যে স্বল্পাবিশিষ্ট টাকা ছিল 'ঝুলি ঝাড়িয়া' আমাকে দিয়া বলিলেন, 'আর ত নাই, এ ক'টা টাকা আপনিই পাঠাইয়া দিন!'—আমি বলিলাম, 'সে কি কথা? আপনি টাকা পাঠাইবেন বলিয়া মনিঅর্ডার লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে! আপনিই উহা পাঠাইয়া দিন, আমি পরে পাঠাইব।' অরবিন্দ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'তা হয় না, আমার চেয়ে আপনারই দরকার বেশী, আমি পরে পাঠাইলেও ক্ষতি নাই।'—তাঁহার মনিঅর্ডারের 'ফরম' লেখা অর্দ্ধপথেই বন্ধ হইল। তিনি তাহা টেবিলের এক পাশে ফেলিয়া রাখিয়া

মহাভারত খুলিয়া 'সাবিত্রী ও সত্যবানের' উপাখ্যান অবলম্বনে কবিতা লিখিতে বসিলেন।"

—ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিদিনের তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে মানুষের যেরূপ যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় সেরূপ আর কিছুতেই পাওয়া যায় না।

"অরবিন্দ বলিতেন, নিজের কথা যত কম প্রকাশ করা যায়, ততই ভাল।—এই জন্যই বোধ হয় তিনি কথাও কম বলিতেন।" স্বল্পভাষী বলিয়া অরবিন্দ বরোদায় বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন না এবং তাঁহার বন্ধু-বান্ধবও অধিক ছিল না। কিন্তু যাঁহারা একবার তাঁহার বন্ধুত্বের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা ভুলিতে পারেন নাই। বরোদার যাদব-পরিবারের সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মে। মহারাজার বিশিষ্ট বন্ধু এবং বরোদার সুবা বা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত খাসে রাও যাদব ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লেফ্‌টেনাণ্ট মাধব রাও যাদবের সঙ্গে তাঁহার গভীর সৌহার্দ্য হইয়াছিল। "তাঁহাদের কথাবার্তা প্রায়ই ইংরাজীতে হইত, মারাঠী ভাষাতেও কখনও কখনও হইত। অরবিন্দ মারাঠী ভাষা বেশ বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু ভাল বলিতে পারিতেন না, তবে বাংলা অপেক্ষা ভাল বলিতে পারিতেন। গল্প করিতে করিতে খুব হাসিতেন।"

অরবিন্দকে প্রায়ই রাজ-দরবারে বা 'লক্ষ্মী বিলাস প্রাসাদে' যাইতে হইত, আবার কখনও কখনও সময়ের অভাবে তিনি মহারাজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেও পারিতেন না। কিন্তু সাধারণ সাজ-পোষাকেই তিনি সর্ব্বত্র যাইতেন। সাহেবী টুপী ব্যবহার না করিয়া তিনি 'পিরাণী টুপী' ব্যবহার করিতেন। তাঁহার কিছুমাত্র বিলাসিতার মোহ বা আড়ম্বর ছিল না।

এক অতি সাধারণ লোহার খাট ছিল তাঁহার বরোদার শয়ন পালঙ্ক

বরোদার দারুণ শীতেও তিনি সামান্য একখানা কম্বল মাত্র গায়ে দিয়া রাত্রি যাপন করিতেন—তখন হইতেই যেন তাঁহার কৃচ্ছ্র সাধনের আয়োজন হইতেছিল। অতি অল্প মূল্যের একখানি আলোয়ান তাঁহার শীতবস্ত্রের কাজ করিত। "তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য নিরত পরদুঃখকাতর আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্য কিছু মনে হইত না; যেন জ্ঞান-সঞ্চয়ই তাঁহার জীবনের ব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য কর্ম্মকোলাহলমুখরিত সংসারে থাকিয়াও যেন তিনি কঠোর তপস্যায় মগ্ন!'

ইংরাজীতে যাহাকে "Plain living and high thinking' বলে তিনি যেন তাহার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। তিনি অল্পাহারী ও মিতাচারী ছিলেন। কিন্তু বরোদায় সে অল্পাহারও অধিকাংশ দিন নিতান্ত অরুচিকর খাদ্য সাহায্যেই সমাধা করিতে হইত। রন্ধন অত্যন্ত অতৃপ্তিকর হইলেও অরবিন্দ কখনও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না।

বরোদায় থাকিতেই অরবিন্দ গীতার 'শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ"—অর্থাৎ শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, মান অপমান তুল্য মনে করিতে চেষ্টা করিতেন। মহারাজ গায়কবাড় তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু তাঁহার অনুগ্রহ লাভের জন্য অরবিন্দ কখনও লালায়িত হন নাই। অন্যান্য স্থানের ন্যায় বরোদায়ও উচ্চতর রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে দলাদলির অভাব ছিল না, কিন্তু অরবিন্দ কখনও কোন দলাদলিতে যোগ দিতেন না।

সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ, নিন্দা-প্রশংসা কিছুতেই অরবিন্দ বিচলিত হইতেন না। একবার বরোদারাজের নিমন্ত্রণে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বরোদায় গমন করেন। রমেশচন্দ্র রামায়ণ ও মহাভারতের সংক্ষিপ্ত ইংরাজী পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিয়া তৎপূর্ব্বেই বিলাতে ভূয়সী

প্রশংসা লাভ করিয়াছেন—ইংরাজীতে গদ্যে ও পদ্যে উপন্যাস, কাব্য, ইতিহাস ইত্যাদি রচনা করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। অরবিন্দের কবি-প্রতিভার কথা ইতিপূর্ব্বেই তিনি অবগত হইয়াছিলেন; এখন অরবিন্দও রামায়ণ ও মহাভারতের বিশেষ বিশেষ অংশ অনুবাদ করিয়াছেন শুনিয়া রমেশচন্দ্র তাহা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অরবিন্দ কিছু কুণ্ঠিতভাবেই তাঁহাকে উহা দেখাইলেন। সেই সুন্দর কবিতাগুলি পাঠে রমেশচন্দ্র যারপরনাই মুগ্ধ হইলেন এবং তাহাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, অরবিন্দের রচনার তুলনায় তাঁহার নিজের অনুবাদ ছেলেখেলামাত্র হইয়াছে—পূর্ব্বে ইহা দেখিলে তিনি কখনও তাহা ছাপিতেন না। দত্ত মহাশয়ের এই প্রশংসায়ও অরবিন্দ নির্ব্বিকার রহিলেন।

অরবিন্দ "ইংরাজীর নানা ছন্দে কবিতা লিখিতেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার। তাঁহার ইংরাজী কবিতাগুলি সরল ও মধুর; বর্ণনা অতি পরিস্ফুট ও অতিরঞ্জন-বিরহিত। শব্দ-চয়নের শক্তিও তাঁহার অসামান্য। তিনি কখনও শব্দের অপপ্রয়োগ করিতেন না।......প্রায়ই কাটাকুটি করিতেন না। লিখিবার পূর্ব্বে সিগারেট টানিতে টানিতে খানিকটা ভাবিয়া লইতেন; তাহার পর তাঁহার লেখনী-মুখে ভাবের মন্দাকিনী প্রবাহিত হইত। তিনি দ্রুত লিখিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু লিখিতে আরম্ভ করিয়া লেখনীকে বিরাম দিতেন না। সে সময় কেহ তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে বিরক্ত হইতেন; কিন্তু সে বিরক্তি অন্যে বুঝিতে পারিত না।......কোন রিপুকেই তাঁহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখা যাইত না। বিশুদ্ধ সাধনা ভিন্ন মানুষ এরূপ আত্মজয়ী ও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না।"

·······ব্যাস অপেক্ষা আদি কবি বাল্মীকির তিনি অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। বাল্মীকির ন্যায় মহাকবি পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই, ইহাই তাঁহার ধারণা।......তিনি বলিতেন, 'মহাকবি দান্তের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, হোমারের 'ইলিয়াদ' পাঠে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম ;—ইউরোপের সাহিত্যে তাহা অতুলনীয়। কিন্তু কবিত্বে বাল্মীকি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রামায়ণের তুল্য মহাকাব্য পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই।"

একবার বরোদা সহরে প্লেগের অতিরিক্ত প্রকোপের জন্য অরবিন্দের বাসস্থান নগরের প্রান্তে এক নির্জ্জন গৃহে স্থানান্তরিত হয়। সেই গৃহে দিনে মাছি ও রাত্রে মশার উপদ্রবে লোকের পক্ষে বাস করা বিশেষ কষ্টকর ছিল। কিন্তু এইরূপ কদর্য্য গৃহে বাস করিতেও অরবিন্দ কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। তীব্র মশক-দংশন অগ্রাহ্য করিয়াও তিনি প্রতিদিন রাত্রি প্রায় একটা পর্য্যন্ত নানা দেশীয় নানা ভাষার কাব্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন।

ইংলণ্ড ও বরোদা—উভয় স্থানেই নানা বিষয়ক সাহিত্য আলোচনার মধ্য দিয়াও যেন অরবিন্দ নিজেকে দেশসেবার জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন—ইহাও যেন তাঁহার পক্ষে একপ্রকার সাধনা ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী অরবিন্দ অত্যন্ত মনোযোগ ও শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিতেন। "বঙ্কিমের প্রতি তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। তিনি বলিতেন, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের অতীত ও বর্ত্তমানের ব্যবধানের উপর স্বর্ণ-সেতু। অরবিন্দ ইংরাজীতে একটি সুন্দর 'সনেট' লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা-ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিলেন। * তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বাঙ্গলা

* শ্রীঅরবিন্দ প্রণীত Rishi Bankim পুস্তক দ্রষ্টব্য।

প্রবন্ধগুলি পাঠে বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতেন ;...বলিতেন, স্বামীজীর ভাষায় প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, ভাষার ভাবের এরূপ ঝঙ্কার, শক্তি ও তেজ অন্যত্র দুর্লভ।"

স্বয়ং গান-বাজনা না জানিলেও অরবিন্দ বরাবরই সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম পিতার পুত্র হইলেও থিয়েটারের নামে তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিতেন না। "কলিকাতায় আসিয়া তিনি দুই এক দিন 'ষ্টার থিয়েটারে' অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন।...কিন্তু তিনি থিয়েটারে বানর-নাচের পক্ষপাতী ছিলেন না। থিয়েটারে উদ্দেশ্যহীন অশ্লীল অসার নাটকের অভিনয় হয়, ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না।"

"জ্যোতিষ শাস্ত্রে অরবিন্দের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। মানবজীবনের উপর গ্রহ-নক্ষত্রাদির প্রভাব আছে, ইহা তিনি স্বীকার করিতেন। কোষ্ঠীপত্র দেখিয়া জাতকের জীবনের শুভাশুভ জানিতে পারা যায়, এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।"

অরবিন্দ রুশীয় সাহিত্যের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে অনেক সময়ই বলিতেন, সাহিত্য ও সুকুমার শিল্পে রুশিয়া অচির ভবিষ্যতেই ইউরোপের শীর্ষস্থান অধিকারে সক্ষম হইবে।—তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় নাই।

"বরোদার ইতর ভদ্র সকলেই মিঃ ঘোষের নাম জানিত। যাহারা তাঁহাকে চিনিত, তাহারা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। বরোদার শিক্ষিতসমাজ তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার সম্মান করিতেন; মারাঠা-সমাজে অরবিন্দ বাঙ্গালীর গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। বরোদার ছাত্রসমাজে অরবিন্দ দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষ অপেক্ষা এই বাঙ্গালী অধ্যাপক ছাত্রসমাজের

অধিকতর সম্মান ও বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনার প্রণালীতে তাহারা মুগ্ধ হইয়াছিল।"

ছাত্রজীবনে অরবিন্দের উদার জীবনের স্পর্শলাভ করিয়া একদল মহারাষ্ট্রীয় যুবক তখন লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বে রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশসেবা করিতেছিলেন। অরবিন্দের দেশপ্রেমের পরিচয় লোকমান্য তিলক যথেষ্ট পাইয়াছিলেন। সেইজন্য পণ্ডিচারীর যোগমগ্ন জীবন হইতে অরবিন্দকে পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবর্ত্তিত করিতে তিনি বহুবার চেষ্টা করিয়াছেন। মহারাষ্ট্র দেশ অরবিন্দকে চিনে, জানে—এইজন্য ঐ প্রদেশ একাধিকবার তাঁহাকে কংগ্রেসের সভাপতি পদে অভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে, কিন্তু অরবিন্দ সম্মত না হওয়াতে সে-প্রস্তাব অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

প্রায় দশ বৎসর কাল অরবিন্দ নীরবে মহারাষ্ট্রীয় যুবকদের মধ্যে কর্ম্ম করিয়াছেন। তাঁহার সে সেবাব্রত মহারাষ্ট্র প্রদেশ কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করিয়াছে এবং সেইজন্য উক্ত প্রদেশের সহিত বাংলার আত্মীয়তা দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়াছে।

একবার "অরবিন্দ বোম্বের 'ইন্দু-প্রকাশ' নামক সাময়িক পত্রিকায় কংগ্রেসের কতকগুলি ত্রুটী প্রদর্শন করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কংগ্রেসের অন্ধ সেবকগণ তাঁহার অকাট্য যুক্তি খণ্ডন করিতে না পারিয়া তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।... এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশের অব্যবহিত পরে, বোম্বাই হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি স্বর্গীয় রাণাডে মহাশয়ের সহিত অরবিন্দের সাক্ষাৎ হইয়াছিল; সেই সময় এই সকল প্রবন্ধের কথা লইয়া রাণাডে মহাশয়ের সহিত তাঁহার বাদানুবাদও হইয়াছিল। বহুদর্শী বিজ্ঞোত্তম মহামতি রাণাডে মহাপণ্ডিত

মনীষী হইলেও, তিনিও নাকি অরবিন্দের যুক্তি খণ্ডন করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার প্রবন্ধে কংগ্রেসের অনিষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় রাণাডে তাঁহাকে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনায় বিরত হইতে অনুরোধ করেন; অরবিন্দ তাঁহার সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।"

শোনা যায়, বরোদায় অবস্থান কালে লীলা বা লেলে নামক এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের সহিত অরবিন্দের পরিচয় হয়। এই ব্রাহ্মণটি মহাযোগী ছিলেন। তাঁহার নিকটে অরবিন্দ প্রথমে ভারতীয় যোগ-পদ্ধতি শিক্ষালাভ করেন এবং তদবধি যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হ'ন।

এই দশ-বারো বৎসর কাল অরবিন্দ দেশের বাহিরে ছিলেন বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই তাঁহার দৃষ্টি ছিল জন্মভূমি বাংলার উপর। 'জননী বঙ্গভূমি'র 'ভুবন-মনোমোহিনী' রূপ তাঁহাকে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করিতেছিল। তাঁহার ক্রমশঃ মনে হইতেছিল যে, বাংলাদেশই তাঁহার প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র। যখন তিনি মাতৃভূমির আহ্বান সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পাইলেন—স্বদেশসেবার প্রেরণা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন, তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া, বরোদার রাজকার্য্যে ইস্তফা দিয়া বাংলা-মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিলেন।

৪

বাংলায়

"এবার তোর মরা গাঙ্গে বান এসেছে
জয় মা বলে ভাসা তরী"- -রবীন্দ্রনাথ

১৯০৫ সাল। বাংলার মরা গাঙ্গে সেদিন যে প্লাবন আসিয়াছিল, তাহা আজ সমস্ত ভারতের দুইকূল ছাপাইয়া গিয়াছে। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্ম; ভারতের দেশহিতৈষী সুধীবর্গ তখন হইতে প্রতি বৎসর ভারতের নানা স্থানে সম্মিলিত হইয়া দেশের কথা, সরকারের কার্য্যকলাপের কথা আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। আবেদন-নিবেদন দ্বারা দেশের অভাব-অভিযোগের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। দেশ-প্রেমের ভাব ধীরে ধীরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসারিত হইতেছিল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে দেশের সাধারণ লোকের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না।

[illegible] ফিরিয়া পাইতেছিল; চীন, জাপান ও নব্য তুর্কীর জাগরণ, পশ্চিমের আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতালাভের অসাধারণ প্রয়াস—এই সকল পৃথিবীতে তখন নূতন যুগের সূচনা করিতেছিল। "ভারত কি শুধু ঘুমায়ে রয়?" হেম-কবির এই মহা-আহ্বানে বাংলার তথা ভারতের শিক্ষিত সমাজ তখন সুপ্তোত্থিত হইতেছিল।

মহারাষ্ট্র-কেশরী লোকমান্য তিলক প্রথমে এই দেশাত্মবোধকে সাধারণের মধ্যে বিস্তারিত করিবার চেষ্টা করেন। শিবাজীর স্মৃতি-উদ্বোধনকল্পে তিনি বৎসরে বৎসরে 'গণপতি মেলার' পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। সেই মেলায় ছত্রপতি শিবাজীর দেশপ্রেম ও বীরত্বকাহিনী প্রচারিত হইত। বাংলায়ও 'শিবাজী উৎসব' প্রবর্ত্তিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে কবিবর রবীন্দ্রনাথ একটি অনুপম কবিতা রচনা করিয়া ছত্রপতি শিবাজীকে সম্বর্দ্ধিত করেন।* তাঁহার তেজপূর্ণ দেশপ্রেমের কবিতা, গান ও প্রবন্ধগুলিও তখন দেশবাসীকে আত্মনির্ভরতা—আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে আহ্বান করিতেছিল। স্বামী বিবেকানন্দের 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' ও দেশ-সেবার জন্য সর্ব্বস্বত্যাগের বাণী তৎপূর্ব্ব হইতেই দেশবাসীর প্রাণে আশার সঞ্চার করিতেছিল।

এই শুভক্ষণে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জ্জন বঙ্গভঙ্গের (Partition of Bengal) প্রস্তাব করেন। সমস্ত দেশব্যাপী এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সভাসমিতি হয়—কংগ্রেসের অন্যতম কর্ণধার, বাংলায় কেন, সমগ্র ভারতে দেশাত্মবোধের প্রবর্ত্তক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন উত্থাপন করেন। কিন্তু সেই আন্দোলনকে উপেক্ষা করিয়া লর্ড কার্জ্জন ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বা ৩০-এ আশ্বিন প্রস্তাবটিকে কার্য্যে পরিণত করিবার—'Settled fact' করিবার সঙ্কল্প করেন।

প্রতি বৎসর কংগ্রেস ও প্রাদেশিক সম্মিলনাদি নানা সভা সরকারের নিকট 'আবেদন-নিবেদন'-এর থালি সাজাইয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহার

---

* শিবাজী উৎসব—পূরবী, ২৩৬-২৪৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পরিবর্ত্তে লাভ করিয়াছে শুধু উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য। দেশবাসীর কোন 'আবেদন-নিবেদন'ই যে শ্রবণযোগ্য নহে, তাহা বঙ্গভঙ্গ করিয়া লর্ড কার্জ্জন বিশেষভাবে বাংলার লোকদের সেদিন সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

৩০-এ আশ্বিন বাংলার সর্ব্বত্র সভাসমিতি করিয়া রাখীবন্ধন ও বিলাতী-বর্জ্জন (Boycott) আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করা হয়। কোন্ অলৌকিক শক্তির প্রেরণায় সেদিন যে সমস্ত বাংলায় নূতন প্রাণ আসিয়াছিল, তাহা তখনকার নেতারাও বোধ হয় ভালরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। বাংলার সেই অপরূপ জাগরণ দেখিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছিলেন—

"বাংলা দেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি,
ঐ অপরূপ রূপে বাহির হ'লে জননী!"

ঐ আন্দোলনের নেতা সুরেন্দ্রনাথও সেই জাগরণের রূপে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এই সম্পর্কে পরে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ—

'আমি বিপ্লব কখনও স্বচক্ষে দেখি নাই এবং বিপ্লব যে কি প্রকার, তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। কিন্তু আমার মনে হয়, বিপ্লবের সূচনার পূর্ব্বে জনসাধারণের মধ্যে যে উন্মাদনা আসে ও তাহাদের মনোভাবের যেরূপ আমূল পরিবর্ত্তন হয়, তাহার আভাস স্বদেশী আন্দোলনের জাগরণের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে পাইয়াছি। একটি সম্পূর্ণ নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। যুবাবৃদ্ধ, ধনিনির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত—সকলেই যেন সেই অশরীরী প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া উঠে; তাহারা যেন এক নূতন চেতনা—নূতন সত্তা লাভ করে। তখন যুক্তিতর্কের

অবসর থাকে না, বিচারশক্তি পরাজিত হয়—এবং এক বিরাট ভাবাবেশ সমস্ত দেশের প্রাণকে আলোড়িত করিয়া তাহার খরস্রোতের সম্মুখে যাহা-কিছু পড়ে তাহাকেই ভাসাইয়া লইয়া যায়।' *

দেশে সেদিন সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, বাণিজ্যে, শিক্ষায়, দীক্ষায় নূতনের জয়যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল। এই জয়যাত্রার বংশীধ্বনি সুদূর প্রবাসে—বরোদায় থাকিয়াও অরবিন্দ শুনিলেন। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—মনে করিলেন যে, সময় উপস্থিত, তাঁহারও দেশের জন্য কিছু উৎসর্গ করিবার আছে। যে শিক্ষাদীক্ষায়, যে জ্ঞানধর্মের আলোচনায় এতকাল নিভৃতে যাপন করিয়াছেন, এইবার তাহা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।—সুখ তুচ্ছ, আরাম লজ্জাকর, তীরে বসিয়া বন্যার সৌন্দর্য্য উপভোগ এখন নির্বুদ্ধিতা, এখন 'জয় মা!' বলিয়া অকূলে তরী ভাসাইতে হইবে।

সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া বাংলার অরবিন্দ বাংলায় ফিরিয়া আসিলেন। বাংলার—সমস্ত ভারতের সে এক পরম শুভ মুহূর্ত্ত। সুদূর প্রবাসে বসিয়াই অরবিন্দ বুঝিয়াছিলেন যে, শিক্ষার অভাবই দেশের দুর্দ্দশার মূল। প্রকৃতপক্ষেও কোন আন্দোলনকে mass movement বা গণ-আন্দোলনে পরিণত করিতে হইলে, সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ভিন্ন অন্য সহজ, সরল পন্থা নাই। আজ ইউরোপ যে শুধু পাশবিক শক্তির বলেই প্রায় সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করিতে পারিয়াছে, ইহা সত্য নহে; জ্ঞানবলেও ইউরোপ আজ বলীয়ান্।

---

* Surendranath Banerjea—A Nation in Making, ১৯৭ পৃঃ।

ইংলণ্ডের একটা মুচি বা মুটেও অল্পবিস্তর লেখাপড়া জানে, দেশের ও পৃথিবীর সংবাদ নিয়মিত পাঠ করে। কেবল হুজুগে বা বক্তৃতায় দেশোদ্ধার হয় না। দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়োজন। তাই অরবিন্দ "এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা"—দেশে শিক্ষা-বিস্তারের এই সঙ্কল্প লইয়া বাংলায় আসিলেন; বাংলায় তখন তাঁহার ক্ষেত্রও প্রস্তুত হইয়াছিল।

দেশের যুবকগণ তখন দলে দলে এই প্রবল আন্দোলনে যোগ দিতেছিল। সরকার তখন ছাত্রদের এই আন্দোলনে যোগ দিতে নিষেধ করিয়া এক 'সার্কুলার' জারি করিলেন। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় ব্যর্থ হইল। সেই যুগের বিপ্লব-আন্দোলনের অন্যতম নেতা সুলেখক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'নির্ব্বাসিতের আত্মকথা' পুস্তকে তখনকার যুবকদের মনোভাবের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—

"বাংলায় সে একটা অপূর্ব্ব দিন আসিয়াছিল। আশার রঙীন নেশায় বাঙালীর ছেলেরা তখন ভরপুর। 'লক্ষ পরাণে শঙ্কা না মানে, না রাখে কাহারো ঋণ।' কোন্ দৈবী স্পর্শে যেন বাঙালীর ঘুমন্ত প্রাণ সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল। কোন্ অজানা দেশের আলোক আসিয়া তাহার মনের যুগযুগান্তের আঁধার কোণ উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছিল। 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।'—রবীন্দ্র যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা সেই সময়কার বাঙালী ছেলেদের ছবি। সত্যসত্যই তখন একটা অলন্ত বিশ্বাস আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। আমরাই সত্য, ইংরেজের তোপ, বারুদ, গোলাগুলি, পল্টন, মেশিন গান—

ওসব শুধু মায়ার ছায়া! এ ভোজবাজীর রাজ্য, এ তাদের ঘর—আমাদের এক ফুৎকারেই উড়িয়া যাইবে।"

'সার্কুলার' জারি করার ফল হইল এই যে, আন্দোলন স্কুল, কলেজে আরও ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িল। কলিকাতায় একটি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ (National Council of Education) স্থাপিত হইল। তাহার অধীনে বাংলার স্থানে স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় ও কলিকাতা ও রংপুরে দুইটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা দান করিয়া এই জাতীয় শিক্ষাপরিষদে প্রাণদান করিলেন। বাংলার দুর্ভাগ্যক্রমে জাতীয় বিদ্যালয়গুলি অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, কেবল যাদবপুরের কলেজ অব্ টেক্‌নলজি (College of Technology) তাহার একটি কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষাপরিষদে অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এই অনুষ্ঠানটির সহিত অধিক কাল সম্বন্ধ রাখিতে পারিলেন না। এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকরী সমিতির (Executive Committee) অন্যান্য সভ্যগণের সহিত মতের পার্থক্য হওয়াতে তিনি শীঘ্রই অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিলেন।

জাতীয় শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে জাতির প্রাণের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইত না। বিদেশী শিক্ষা আমাদের এমন অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে যে, আমরা মুখে জাতীয়তার যতই গৌরব করি না কেন, আমাদের হাবভাব, চিন্তাধারা, শিক্ষাপ্রণালী সকল বস্তুতেই আমাদের বিজাতীয় মনোভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে। যাহা হউক, জাতীয় শিক্ষালয়ের নেতৃত্ব দেশীয় লোকের উপরেই ছিল, তাহার মধ্যে অল্পস্বল্প নূতন ভাবও আনীত হইয়াছিল, কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতি বা প্রণালী সরকারী

বিদ্যালয়গুলি হইতে বিশেষ স্বতন্ত্র ছিল না। কিন্তু অরবিন্দ চাহিয়াছিলেন শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন। তাঁহার মতে আমাদের দেশের মাটিতে অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল প্রকৃত সরসতা লাভ করিতে পারে না।

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে যে জাতীয় ভাবের উদ্বোধন হয় না, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এই শিক্ষায় আমাদের স্বজাতির উপরে শ্রদ্ধার বৃদ্ধি হয় না, বরং জগতে আমরা যে নিকৃষ্ট জাতি, আমরা চিরকালই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিলাম এবং ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবেই আমরা অন্ধকার হইতে আলোকে আসিয়াছি, এই বিশ্বাস শৈশব হইতেই আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়। ভারতের ইতিহাস পাঠে শিবাজীকে দস্যু বলিয়া জানি, ভূগোলে আমরা পৃথিবীর লোহিত-চিহ্ন-রঞ্জিত সুবিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরিচয় পাইয়া ভীতিবিহ্বল হই, ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসে আমরা ইংরেজের দেবচরিত্র ও বীরত্বের আখ্যান পাঠ করি এবং আমরা হীন, আমরা চির-দরিদ্র, নিতান্ত কৃপার পাত্র—এই শিক্ষা লাভ করিয়া চরিতার্থ হই।

প্রকৃত জাতীয় ভাব আনিতে হইলে এই শিক্ষা, এই আত্ম-অনাদরের দীক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করি বলিয়াই আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে। অরবিন্দ সেই গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করিয়া শিক্ষায় প্রকৃত জাতীয় ভাব আনিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এইস্থলে শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।*

---

* বিস্তারিত আলোচনার জন্য তৎপ্রণীত A System of National Education পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

অরবিন্দ প্রকৃত শিক্ষার তিনটি মূলনীতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—

প্রথমতঃ, কাহাকেও জোর করিয়া কিছু শিখান যায় না। নূতন কিছু শিক্ষাদান করা বা ধরিয়া-বাঁধিয়া কাজ আদায় করা প্রকৃত শিক্ষকের কর্ত্তব্য নহে, তিনি একজন সহায়ক ও পথপ্রদর্শক মাত্র। ইঙ্গিতে পথ-নির্দ্দেশ করাই তাঁহার কাজ, জোর করিয়া মনের উপর কিছু চাপাইয়া দেওয়া তাঁহার কাজ নহে। তিনি প্রকৃতপক্ষে ছাত্রের মনকে গড়িয়া তুলেন না, তাহার জ্ঞানলাভের অস্ত্রগুলিকে কিরূপে সুশাণিত করিয়া তুলিতে হইবে, তিনি তাহার পন্থা নির্দ্দেশ করেন, এবং সেই কার্য্যে তাহাকে সহায়তা ও উৎসাহ দান করেন। তিনি তাহাকে কোন বিষয়ে জ্ঞান দান করেন না, স্বয়ং কিরূপে জ্ঞান আহরণ করিতে হয়, তিনি তাহারই পথ-প্রদর্শন করেন। ছাত্রের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের উদ্বোধন তিনি করেন না, কোথায় সে জ্ঞান সুপ্ত অবস্থায় আছে এবং কি প্রকারে তাহাকে জাগ্রত করিতে হয়, তিনি কেবল তাহাই তাহাকে দেখাইয়া দেন।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার জন্য ছাত্রের মনকে উত্তম রূপে জানিতে হইবে। পিতামাতা বা শিক্ষকের ইচ্ছানুযায়ী শিশুকে গড়িয়া তুলিবার পদ্ধতিকে অরবিন্দ একটি বর্ব্বর ও অজ্ঞানোচিত কুসংস্কার বলিয়া মনে করেন। শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী তাহাকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইবার সুযোগ দিতে হইবে। সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনে কোন্ কোন্ বিশেষ গুণ, শক্তি-সামর্থ্য, ধারণা বা সৎবৃত্তি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, পূর্ব্বাহ্নেই তাহার ব্যবস্থা করা বা কোন পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট পথে সন্তানের জীবন-ধারাকে পরিচালিত করার ন্যায় বড় ভুল পিতামাতার পক্ষে আর কিছু হইতে পারে না। মানব-প্রকৃতিকে জোর করিয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করাইলে চিরদিনের জন্য তাহার ক্ষতি করা হয়, তাহার উন্নতির পথ রুদ্ধ হয় এবং তাহার পূর্ণতা লাভে বাধা জন্মে।

ইহার দ্বারা মানবাত্মাকে একান্ত স্বার্থপরের ন্যায় উৎপীড়ন এবং জাতিকে নির্মম ভাবে আঘাত করা হয় ; জাতি মানবের শ্রেষ্ঠ দান হইতে বঞ্চিত হইয়া তৎপরিবর্তে যাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ, অস্বাভাবিক ও সাধারণ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কিছু ঐশ্বরিক, কিছু নিজস্ব শক্তি আছে।, যত অল্পই হউক না কেন, ভগবান প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই শক্তি ও পূর্ণতার সম্ভাবনা দান করিয়াছেন, সে ইচ্ছামত তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে, অথবা তাহাকে অবহেলাও করিতে পারে। সেই শক্তিকে আবিষ্কার করিয়া তাহাকে বাড়াইয়া তুলিতে ও ব্যবহার করিতে হইবে। অন্তর্নিহিত সেই খাঁটি জিনিষটিকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া তাহাকে পূর্ণতালাভের ও মহৎ কাজে নিয়োজিত হইবার সুযোগ দেওয়াই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

তৃতীয়তঃ, যাহা নিকটে তাহাকেই প্রথমে ধরিয়া পরে দূরের বস্তুর দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে—বর্তমানকে জানিয়া পরে ভবিষ্যতের সহিত পরিচয় করিতে হইবে। নিকটের বা চারি পাশের বস্তু হইতে দূরের সামগ্রী মানুষের মনকে প্রথমে আকর্ষণ করে না। নিকটের বস্তুর প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিয়া ক্রমে মানুষ দূরের সামগ্রীকেও জানিতে চাহে। মানব-প্রকৃতির ভিত্তি তাহার বংশের ধারা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, জাতি, স্বদেশ, সেই মৃত্তিকা যাহা হইতে রস গ্রহণ করিয়া সে পুষ্ট হয়, সেই বায়ু যাহাতে সে বিচরণ করে, বিচিত্র দৃশ্য, শব্দ ও তাহার চিরাচরিত অভ্যাস-সমূহ এবং এমন কি তাহার অতীত জীবন—এই সমুদায়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। অজ্ঞাতসারে মানুষের চরিত্রকে সুগঠিত করে বলিয়া ইহাদের প্রভাব যে বিন্দুমাত্র কম তাহা নহে। সেইজন্য ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া আমাদের প্রথম শিক্ষারম্ভ করা কর্তব্য। যে ভূমিতে

মানবের প্রকৃতি ও মন পরিবর্দ্ধিত সেখান হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া, যে-জীবনে তাহাকে বিচরণ করিতে হইবে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিজাতীয় এক জীবনের কাল্পনিক চিত্র এবং ধারণায় পরিবেষ্টনের মধ্যে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা আমাদের উচিত নহে। যদি বাহির হইতে কিছু আহরণ করিতে হয় তাহা হইলে মনের উপরে বলপূর্ব্বক তাহা আরোপ না করিয়া স্বেচ্ছায় তাহাকে সে বস্তু গ্রহণ করিতে দিতে হইবে। স্বাধীন ও স্বাভাবিক বর্দ্ধন-শীলতাই প্রকৃত উৎকর্ষের মূল। কেহ কেহ আছেন যাঁহাদের চিত্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থায় প্রতিকূলে বিদ্রোহী হইয়া উঠে, যেন তাঁহারা অপর যুগের এবং অপর দেশের মানুষ; তাঁহারা স্বাধীনভাবে তাঁহাদের মনোবৃত্তির অনুসরণ করুন৮ কিন্তু অধিকাংশের চিত্তই অস্বাভাবিক ও বিজাতীয় ধাঁচে গঠিত করিতে গিয়া জীর্ণ, শূন্য ও কৃত্রিম হইয়া উঠে। সকল মানুষকেই কোন না কোন বিশেষ জাতির, বিশেষ যুগের ও বিশেষ সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে, তাহারা যেন অতীতের নবজাত শিশু, বর্ত্তমানের অধিকারী হইয়া ভবিষ্যৎ গঠিত করিয়া তুলিবে ইহাই ভগবানের বিধান। অতীতকে ভিত্তিস্বরূপ ধরিয়া এবং বর্ত্তমানকে তাহার গঠনোপযোগী উপকরণ করিয়া তবে আমরা ভবিষ্যতের উন্নতি-সৌধ-শিখরে আরোহণ করিতে পারিব। প্রত্যেক জাতির শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে এই যে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ইহাদের প্রত্যেকটিরই একটি যথোপযুক্ত ও স্বাভাবিক স্থান থাকা আবশ্যক।

মানুষের মনের নানা স্তরের বৈজ্ঞানিক ও প্রাচীন শাস্ত্রানুযায়ী বিভাগগুলির উল্লেখ করিয়া অরবিন্দ বলেন যে, যথার্থ শিক্ষার জন্য তাহার প্রত্যেক বিভাগ সম্বন্ধেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে হইবে। চিত্ত, মন, বুদ্ধি

ও সহজ সত্যানুভূতি (Intuition)—এই চারিটি স্তরেরই উৎকর্ষ বা 'কালচার' প্রয়োজন।

নৈতিক শিক্ষা (moral training) সম্বন্ধে আজকাল অনেক রকম বুলি শুনা যায়। অনেকে মনে করেন যে, কতগুলি শাস্ত্র বা নীতিকথা অভ্যাসমত শুনাইলেই বালকদের চরিত্রের উন্নতি হয়। প্রত্যহ নীতিকথা শুনিয়া শুনিয়া বা শাস্ত্রকথা উচ্চারণ করিয়া তাহা শুষ্ক কথায় বা অভ্যাসে পরিণত হয়, মনের উপর তাহার বিশেষ কোন প্রভাব থাকে না। ঐরূপে নীতিকথা শিক্ষাদানের পদ্ধতি অনেকটা ইউরোপীয় প্রণালীর অনুকরণ।

অরবিন্দের মতে নৈতিক শিক্ষার প্রথম নিয়ম এই যে, কিছু জোর করিয়া চাপাইয়া দিলে চলিবে না, পথের সঙ্কেতমাত্র করিতে হইবে। নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত, কথোপকথন এবং প্রতিদিনকার গ্রন্থপাঠের দ্বারা এই উদ্দেশ্য প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ হইতে পারে। ঐ সকল গ্রন্থে শিশুদের জন্য উচ্চ আদর্শের দৃষ্টান্ত থাকিবে, কিন্তু তাহা চিত্তাকর্ষক হওয়া চাই, যেন শুষ্ক নীতিকথা মাত্র না হয়) অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্রদের গ্রন্থে মহাপুরুষ-দের মহৎ চিন্তাধারা এবং ইতিহাস ও জীবন-চরিতে তাহার কার্য্যত প্রয়োগের দৃষ্টান্ত থাকিবে। এই সকল গ্রন্থ সৎসঙ্গের ন্যায় কার্য্য করিবে, যদি সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকেরও জীবন মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকে।

নীতিশিক্ষার ন্যায় ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধেও আধুনিক অনেক বিজ্ঞলোকের ভ্রান্ত ধারণা আছে। স্কুল-কলেজে এক ঘণ্টা 'বাইবেল' বা গীতা পাঠ করিলেই ধর্মশিক্ষা হয় না—এই প্রকার ধর্মশিক্ষাকে অরবিন্দ পাশ্চাত্য-জগতের ভ্রম (European error) আখ্যা দিয়াছেন। ইহাতে মানুষের আভ্যন্তরীণ জীবনের বিশেষ পরিবর্তন হয় না—গতানুগতিক বলি

আওড়াইয়া মানুষ ধর্ম্মোন্মাদ (fanatic), বা ভণ্ড ধার্ম্মিক হয়। প্রতি-দিবসের ক্রিয়াকর্ম্মে, আচার-ব্যবহারে ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে—জীবনে তাহার ব্যবহার না হইলে সে ধর্ম্মের কোন মূল্য নাই। অরবিন্দের কথায় 'জীবনে অনুষ্ঠান না করিলে কোন ধর্ম্মশিক্ষারই কোন মূল্য নাই এবং নানাপ্রকারের সাধনা, আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও তপস্যা ধর্ম্মজীবন লাভের একমাত্র উপায়।'

এই ধর্ম্মশিক্ষা ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠানাদি লইয়াও জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের সহিত অরবিন্দের মতভেদ ছিল।

অরবিন্দ বলেন, কোন বিশিষ্ট প্রণালীতে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হউক বা না হউক, ধর্ম্মের সার আদর্শের জন্য—অর্থাৎ, ভগবানের জন্য, মানব জাতির জন্য, স্বদেশ ও পরের জন্য এবং ইহাদের ভিতর দিয়া নিজেদের জন্যও আমাদের বাঁচিতে হইবে। হিন্দু-ধর্ম্মের এই ভাবটি প্রত্যেক জাতীয় শিক্ষালয়ের আদর্শ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভারতীয় বিষয়গুলি ও হিন্দু ধর্ম্ম-শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়গুলি উক্ত আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হইলেই তাহাকে যথার্থ জাতীয় বিদ্যালয় বলা যাইতে পারে; উহাই হইবে তাহার বিশেষত্ব।

আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর আর একটি দোষ এই যে, একসঙ্গে বালককে অনেকগুলি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাচীন কালের প্রণালী সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল; প্রথমে ছাত্রকে একটি বা দুইটি বিষয় ভালরূপ শিক্ষাদান করা হইত, তৎপর ছাত্র প্রয়োজন মত অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষালাভ করিত। বলা বাহুল্য, জাতীয় শিক্ষাপরিষদেও আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীই অনুসৃত হইত।

প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, বালকেরা এক বিষয়ে অধিকক্ষণ মনোনিবেশ করিতে পারে না। কিন্তু অরবিন্দ বলেন,

সেজন্ত দায়ী ছাত্র নহে, অধ্যাপক। অধ্যাপকই বিষয়টিকে একঘেয়ে করিয়া ফেলেন—বিষয়টিকে চিত্তাকর্ষক করিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা করিলে বালক নিশ্চয়ই আগ্রহের সহিত তাহাতে মনোনিবেশ করিবে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টিকে চিত্তাকর্ষক করিতে পারিলেই মনোনিবেশের ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

বিষয়টিকে সহজ ও সুখবোধ্য করার একটি প্রধান উপায় মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া। অরবিন্দের মতে মাতৃভাষাই শিক্ষার প্রকৃষ্ট বাহন। প্রথমে মাতৃভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার দিকেই যাহাতে বালকের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রায় প্রত্যেক বালকেরই স্বাভাবিক কল্পনাশক্তি, শব্দ-চয়ন-ক্ষমতা (instinct for words), অভিনয়শক্তি এবং প্রচুর ভাব ও খেয়াল (idea aud fancy) আছে। এই সকল শক্তিকে জাতীয় সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইবে। দুর্ব্বোধ্য শুষ্ক বানান ও রসহীন পুস্তক পাঠ করিতে না দিয়া বালককে ক্রমশঃ, কিন্তু যথাসম্ভব শীঘ্র (by rapidly progressive stages) জাতীয় সাহিত্যের সরল রচনাবলী এবং তাহার পারিপার্শ্বিক জগতের সহিত পরিচিত করিতে হইবে। এই সময়ে বালকের মনোবৃত্তি-গুলির ও নৈতিক চরিত্রের সম্যক্ বিকাশের প্রতিও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। প্রত্যেক বালকই সুন্দর সুন্দর গল্প, বীরকাহিনী ও দেশপ্রেমের আখ্যান শুনিতে বা পড়িতে ভালবাসে। সুতরাং এই সমস্তের ভিতর দিয়া তাহাকে নিজের অজ্ঞাতসারে স্বজাতীয় ইতিহাসের জীবন্ত ও মহৎ অংশগুলি আয়ত্ত করিবার সুযোগ দিতে হইবে। প্রত্যেক বালকই স্বভাবতঃ অল্লাধিক জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু হইয়া থাকে—সে যেন সব-কিছুতেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতে চায়—টুকরা টুকরা করিয়া

কাটিয়া দেখিতে চায়। বালকের এই সকল গুণের সমাদর করিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে তাহাকে বৈজ্ঞানিক-সুলভ মনোবৃত্তি ও অতি প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভে সহায়তা করিতে হইবে। প্রত্যেক বালকেরই নিজ বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা নানা বিষয় জানিবার—বুঝিবার অদম্য ঔৎসুক্য আছে। নিজের সম্বন্ধেও সে অনেক-কিছু জানিতে চায়। সেই ঔৎসুক্য পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করিয়া বালককে ক্রমশঃ এই পৃথিবী ও তাহার নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে দিতে হইবে। বালক-মাত্রেরই অনুকরণ করিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা থাকে—অল্পস্বল্প কল্পনা-শক্তিও থাকে। ইহার সাহায্যে তাহার ভিতর শিল্প-কৌশল ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

আজকাল শিক্ষার দ্বারা যে আমাদের দেশে মানুষ প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত হইতেছে না, অরবিন্দ তাহা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন। পরীক্ষায় পাশ করিয়া অর্থোপার্জ্জনই এখন প্রধান লক্ষ্য, সেইজন্য শিক্ষার সঙ্গে জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্যগুলির তেমন কোন সংযোগ নাই বলিলেই চলে। এই প্রণালীর শিক্ষায় মানুষের চিন্তাশক্তি মরিয়া যায়, নূতন জ্ঞানলাভের ঔৎসুক্য থাকে না। ইহার দ্বারা কেরাণীর সৃষ্টি হয়, অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিকের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং দেশের উন্নতি করিতে হইলে যথার্থ শিক্ষাদানের আয়োজন করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। নূতন নূতন শিক্ষাপ্রণালীর উপায় উদ্ভাবন করিয়া শিক্ষাকে চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে। সহজ উপায়ে ধর্ম্ম ও নীতির শুষ্ক শিক্ষা দান করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কতকগুলি বিষয়ে অগভীর বা ভাসাভাসা জ্ঞানলাভ করিলে প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য কিছুমাত্র সিদ্ধ হয় না।

ছাত্রের মানসিক শক্তিনিচয়ের বিকাশ সাধন করিয়া প্রথমে তাহাকে মাতৃভাষা ভালরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। ইহার পর অন্যান্য ভাষা বা প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া সহজসাধ্য হইবে—শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের চেষ্টা অধিকাংশ স্থলেই পণ্ডশ্রমমাত্র হইবে না।

এখনকার অনেক রাজনৈতিক নেতা মনে করেন যে, বর্ত্তমানে কেবল রাজনৈতিক কার্য্য করাই সকল দেশবাসীর কর্ত্তব্য। কিন্তু কবি, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সকলেই বিভিন্ন উপায়ে দেশসেবা করিতে পারেন। তাঁহাদের স্বধর্ম্ম বা স্বকীয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সকলেই যে রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশসেবা করিবেন, এমন হইতেই পারে না এবং তাহা উচিতও নয়। তবে এই সকল বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মধারার আরও উন্নতি হইতে পারে, যদি দেশের সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থাকে। সুতরাং রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য স্বরাজ বা স্বায়ত্ত-শাসনের সঙ্গে জাতীয় শিক্ষার সম্পূর্ণ যোগাযোগ রহিয়াছে। ইহাদের কোনটিই একদিনের জন্যও 'wait' বা অপেক্ষা করিতে পারে না। স্বায়ত্তশাসন ও জাতীয়শিক্ষা সম্পর্কে অরবিন্দ যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ—'স্বায়ত্তশাসন এবং জাতীয়শিক্ষা, এই দুইটি আদর্শ অচ্ছেদ্যবন্ধনে বদ্ধ। নিতান্ত অসরল বা অদূরদর্শী না হইলে কেহ ইহাদের একটিকে ত্যাগ করিয়া অন্যটি লাভের চেষ্টা করিতে পারে না। আমরা কেবলমাত্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই চাহি না, আমরা একটি সমুন্নত—মহত্তর ভারতবর্ষকেও চাহি—যে ভারতবর্ষ জাতিসঙ্ঘে গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া মানবজাতিকে অপরূপ দানে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবে।—এবং সে দান একমাত্র তাহার দ্বারাই সম্ভব। মানবের পক্ষে যে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য হইতে শ্রেষ্ঠজ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য লাভ করা সম্ভব নয় তাহা

ভারতবর্ষ পূর্ব্বপুরুষের নিকট হইতে লাভ করিয়াছে। সমস্ত মানবজাতি যে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে, ভারতবর্ষ তাহারই অধিকারী। কিন্তু তাহার হস্ত শৃঙ্খলমুক্ত, আত্মা স্বাধীন, পূর্ণ-বিকশিত ও সমুন্নত এবং জীবন মহামহিমান্বিত হইলেই ভারতবর্ষ সে ঐশ্বর্য্য দান করিতে পারে। স্বায়ত্ত-শাসনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের শক্তি জন্মে—তাহা হইলেই হস্ত শৃঙ্খলমুক্ত হইবে, আত্মা উন্নতির অবকাশ লাভ করিবে, জীবন তাহার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ও অজ্ঞানতা পরিহার করিয়া পুনরায় জ্ঞানালোকে ও মহত্ত্বে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে। কিন্তু কেবলমাত্র জাতীয় শিক্ষাপ্রণালীর দ্বারাই অতীতের ঐশ্বর্য্য, বর্ত্তমানের নূতন সভ্যতার দান ও ভবিষ্যতের মহতী সম্ভাবনায় অনুপ্রাণিত হইয়া আত্মা সম্যক্ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সম্পূর্ণ বিপরীত ও মিথ্যা আদর্শে পরিচালিত, ইহাদের প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালী দুষ্ট ও প্রাণহীন, ইহাদের জীবন্মৃত 'রুটিন' মাফিক কর্ম্মব্যবস্থা নিতান্ত একঘেয়ে, ইহাদের প্রাণশক্তি সঙ্কীর্ণ ও দৃষ্টিহীন—সুতরাং এই প্রণালীর অনুকরণ বা সামান্য সংস্কার ও প্রসারের দ্বারা আত্মার পূর্ণতা লাভ অসম্ভব। একমাত্র জাতির অন্তর-রসে অভিষিক্ত হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে এমন নবচেতনাশালী ব্যক্তিই জাতির নবজাগরণের আশা ও আলোকে প্রবুদ্ধ হইয়া ঐরূপ অখণ্ড—পূর্ণ আত্মা সৃজন করিতে পারে।'

অরবিন্দ স্থির বুঝিয়াছিলেন যে, নূতনতর জাতীয় শিক্ষা-প্রণালীর প্রবর্ত্তনা ভিন্ন জাতির উন্নতির আশা নাই। যাহা হউক, নানা কারণে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অন্যান্য সভ্যদের সহিত তাঁহার মতভেদ হইল। শুনা যায় যে, স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য নানা বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত ছাত্রদের জাতীয় শিক্ষালয়ে গ্রহণ করা লইয়াই প্রধানতঃ অপর

কর্ম্ম-কর্ত্তাগণের সহিত তাঁহার মতভেদ হয়। তিনি বিশেষ করিয়া ঐ সকল ছাত্রকেই গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন, কারণ উহারাই প্রকৃতপক্ষে জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের অধিকারী। জাতীয় বিদ্যালয় মুখ্যতঃ দেশকর্ম্মিগণের শিক্ষাকেন্দ্র হইবে—এখানে জাতীয় ধারায় শিক্ষালাভ করিয়া তাহারা দেশপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠিবে, ইহাই ছিল অরবিন্দের অভিপ্রায়। কিন্তু শিক্ষাপরিষদের প্রবীণ সভ্যগণ ইহাকে ঐরূপ অবিশুদ্ধ(?) শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হইতে দিতে সম্মত হইলেন না। ইহা কেবলমাত্র একটি আদর্শ শিক্ষায়তনরূপে সরকারী শিক্ষার দোষ-ক্রটি সংশোধন করিয়া দেশে সুশিক্ষা প্রচারের সহায়তা করিবে ইহাই ছিল তাঁহাদের সঙ্কল্প। মতের ও আদর্শের এইরূপ মূলগত অনৈক্য হওয়ায় অরবিন্দ অগত্যা জাতীয় শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করিলেন।

৫

কর্ম্মক্ষেত্রে

জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিয়া অরবিন্দ দেশে তাঁহার আদর্শ প্রচারের জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি "বন্দেমাতরম্" নামক নূতন জাতীয় ইংরাজী দৈনিক পত্রিকার সংশ্রবে আসিয়া অল্প দিনের মধ্যেই উহার সম্পাদক সঙ্ঘে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিলেন। স্বনামখ্যাত রাজা, সুবোধচন্দ্র মল্লিক এই পত্রিকা পরিচালনের জন্য যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন এবং বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ইহা সম্পাদনে অরবিন্দের সহকর্ম্মী ছিলেন। এইরূপে তিনি প্রকৃত দেশ-সেবার সুযোগ পাইলেন। "বন্দেমাতরম্"-এর জ্বলন্ত প্রাণস্পর্শী ভাষা, তাহার প্রবন্ধের সারবত্তা, চিন্তাশীলতা দিনের পর দিন দেশে স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিতে লাগিল। দুই কুল বজায় রাখিয়া চলার কথা ইহাতে থাকিত না, কোনরূপ নীচ দলাদলির ভাব থাকিত না—আত্মনির্ভরশীল ও স্বদেশের জন্য ত্যাগপরায়ণ হইবার প্রেরণা থাকিত, প্রকৃত দেশপ্রেম ও দেশসেবার আদর্শ প্রচারিত হইত। ইহার পাঠকগণ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশে এক নবযুগ আনয়নে সহায়তা করিয়াছিলেন।

"বন্দেমাতরম্" নরমপন্থীদের (Moderates)—অর্থাৎ তদানীন্তন কংগ্রেসের নেতাদের 'আবেদন-নিবেদন' প্রথার তীব্র ভাষায় নিন্দা করিত—পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণ না করিয়া দেশবাসীকে আত্মনির্ভরশীল ও

আত্মবিশ্বাসী হইতে প্ররোচিত করিত। সমস্ত ভারতবর্ষে "বন্দেমাতরম্"-এর পাঠক ছিল। এই সকল পাঠক স্বাধীনতার ভাবে এমন উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা ক্রমশঃ অজানিতভাবে এক পতাকার তলে মিলিত হইতেছিলেন। বাংলাদেশে প্রকৃত পক্ষে তখন হইতেই নরমপন্থীদের প্রভাব একরূপ লুপ্ত হয়।

"বন্দেমাতরম্"-এর উদ্দীপনাময়ী ভাষার সামান্য পরিচয় এখানে দেওয়া যাইতেছে। ১৯০৭, খৃষ্টাব্দের ৯ই মে রাত্রিতে সংবাদ আসিল, পঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায় ও সর্দ্দার অজিৎ সিংহকে বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। পরদিনের "বন্দেমাতরম্"-এ এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত রূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইল—

"The sympathetic administration of Mr. Morley has for the present attained its record—but for the present only. Lala Lajpat Rai has been deported out of British India. The fact is its own comment. The telegram goes on to say that indignation meetings have been forbidden for four days. Indignation meetings? The hour for speeches and fine writings is past. The bureaucracy has thrown down the gauntlet. We take it up. Men of the Punjab! Race of the Lion! show these men who would stamp you into the dust that for one Lajpat they have taken away, a hundred Lajpats will arise in his place. Let them hear a hundred times louder your war-cry—*Jay Hindusthan!*"

অর্থাৎ 'মিঃ মর্লি এখনকার মত তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ শাসন-প্রণালীর চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছেন। লালা লাজপৎ রায় ব্রিটিশ ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। এই ঘটনাটি সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ বাহুল্যমাত্র। তারে সংবাদ পাওয়া গেল, চারদিনের জন্য প্রতিবাদ সভা নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রতিবাদ সভা? বক্তৃতা ও সুন্দর রচনার কাল এখন আর নাই। আমলাতন্ত্র আমাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছে—আমরা অবশ্য সে আহ্বানে সাড়া দিব। পঞ্জাববাসী, তোমরা কেশরীর বংশ, তোমরা এই যে-সকল লোক তোমাদিগকে ধূলায় নিষ্পেষিত করিতে চাহিতেছে, ইহাদিগকে দেখাও যে, একজন লাজপৎ রায়কে লইয়া গেলে তাঁহার স্থানে শত লাজপতের আবির্ভাব হইতে পারে। তোমরা শতগুণ উচ্চকণ্ঠে তোমাদের সমরাহ্বান তাঁহাদিগকে শুনাইয়া দেও—**জয় হিন্দুস্থান!**'

১৯০৬ সাল হইতেই অরবিন্দ কংগ্রেসে যোগদান করেন। সেবার দাদাভাই নওরোজীর সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। দেশে তখন নূতন হাওয়া প্রবলভাবে বহিতেছিল। অরবিন্দ, তিলক প্রমুখ জাতিয়তাবাদিগণ কংগ্রেসে যোগদান করিয়া কংগ্রেসের লক্ষ্যকে স্পষ্টতর করিবার চেষ্টা করিলেন। কলিকাতার কংগ্রেসে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ কংগ্রেসের বা ভারতের লক্ষ্য বলিয়া স্থির হইল। এই কংগ্রেসের পরে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ মেদিনীপুর জেলা সম্মিলন ও বরিশাল প্রাদেশিক সম্মিলনে যোগদান করেন। অল্প বিশ্বাস, ক্ষুদ্র আশা ত্যাগ করিয়া দেশবাসীকে স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে দীক্ষিত করাই তাঁহার এই সব সভায় যোগদান করার উদ্দেশ্য ছিল।

কংগ্রেস বা এই সকল সম্মিলন যাহাতে বাৎসরিক 'মজ্‌লিসে'

পরিণত না হইয়া প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকরী হয়, তাহার প্রতি অরবিন্দ বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। এই সকল আলোচনা-কেন্দ্র বা সম্মিলনী ব্যতীত দেশে কার্য্যকরী কতকগুলি অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করিলেন। কংগ্রেসের নিয়মের পরিবর্ত্তনের জন্যও তিনি কয়েকটি প্রস্তাব করেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, কংগ্রেসের প্রাদেশিক প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা হউক। তিনি কংগ্রেসের কার্য্যাবলী (Proceedings) আরও সংক্ষিপ্ত করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেন। সভাপতির দীর্ঘ অভিভাষণ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির বক্তৃতা, বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতির গুপ্ত এবং প্রকাশ্য কার্য্য-বিভাগ ও সাধারণ সভায় বড় বড় বক্তৃতা তিনি অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন। কংগ্রেসের বাৎসরিক সভাপতি বা ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সমূহের পূর্ণ ক্ষমতার (autocracy) তিনি বিরোধী ছিলেন।

কলিকাতা কংগ্রেসে স্বায়ত্ত শাসন, 'বয়কট' ও জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে যে-সকল প্রস্তাব গৃহীত হয়, সেই সকল প্রস্তাবে কংগ্রেসের পুরাতন নেতাগণ সন্তুষ্ট হইলেন না। পর বৎসর ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে স্বায়ত্ত শাসনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়। সেই কংগ্রেসেও অরবিন্দ যোগদান করিয়াছিলেন। মতভেদের ফলে সুরাটের কংগ্রেস দক্ষ-যজ্ঞে পরিণত হইল, সভাস্থলে নূতন ও পুরাতন দলে এমন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় যে, শেষে পুলিশ ডাকিয়া সভা ভঙ্গ করিতে হইয়াছিল।

অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, লোকমান্য তিলক, লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ নেতাগণ Extremist বা চরমপন্থী আখ্যা লাভ করিলেন। দেশের যুবকগণও তাঁহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। এই সকল নেতা যে, কংগ্রেসে বিশেষ অধিকার বা ক্ষমতা লাভের জন্য দেশে

নূতন আদর্শ প্রচার করিতে ছিলেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রকৃত বীরত্ব, সাহস, তেজ ও উচ্চ আশা দেশবাসীর মনে জাগাইয়া তোলাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

অরবিন্দের স্বাদেশিকতা যে কতদূর আন্তরিক ছিল, তাঁহার পরিচয় তাঁহার কয়েকখানা গোপনীয় পত্র হইতে বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। এই পত্রগুলি তিনি ঐ-সময় তাঁহার সহধর্ম্মিণী মৃণালিনী দেবীকে লিখিয়াছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দের গ্রে ষ্ট্রীটস্থ বাসা খানাতল্লাসী করিয়া পুলিশ এই অমূল্য চিঠিগুলি উদ্ধার করে। পরে আলিপুরের বোমার মামলায় অরবিন্দের মতবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে এগুলিকে আদালতে ব্যবহার করা হয়। ইহার বহুদিন পরে এই পত্র কয়েকখানি 'অরবিন্দের পত্র' নামে ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রগুলি গোপনীয়, সরকারের এইগুলিকে সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করিবার ন্যায়তঃ কোন অধিকারই ছিল না; কিন্তু সে যাহা হউক, উহার ফল ভালই হইয়াছে। অরবিন্দ যে ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্রই ত্যাগের আদর্শে পাগল হইয়াছিলেন, এই দৈবাৎ প্রকাশিত পত্র কয়েকখানি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইহাদের অল্প পরিসরের ভিতর তাঁহার মর্ম্মব্যথার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সাংসারিক সুখলাভের জন্য বিবাহ যে হিন্দুমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য, অরবিন্দ তাহা জানিতেন। কিন্তু বিবাহের অল্পকাল পরেই দেশের আহ্বান তাঁহার সমগ্র চিত্তকে আলোড়িত করিয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সর্ব্বস্ব ত্যাগের পণ করিতে হইবে,—সুখের, আরামের পথ তাঁহার জন্য নহে। এইজন্য তিনি তাঁহার স্ত্রীকেও নিজের পথে আনিতে প্রয়াস পাইতেন। স্ত্রীকে ত্যাগ করিবার স্পৃহা তাঁহার আদৌ ছিল না। 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ' বাক্যটির মর্ম্ম ভালরূপ বুঝিয়াই তিনি তাঁহার

স্ত্রীকে ত্যাগের পথে আনিবার জন্য উপদেশ দিয়া এই অমূল্য পত্র কয়েকখানি লিখিয়াছিলেন। নিম্নে একখানি পত্রের বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধৃত হইল। চিরসুখপালিতা স্ত্রীকে অরবিন্দ লিখিতেছেন—"তুমি বোধ হয় এর মধ্যে টের পেয়েছে, যাহার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িত, সে বড় বিচিত্র ধরণের লোক। এই দেশে আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, কর্ম্মের ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়। সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ। সামান্য লোক, অসাধারণ মত, অসাধারণ চেষ্টা, অসাধারণ উচ্চ আশাকে যাহা বলে তাহা বোধ হয় তুমি জান। এই সকল ভাবকে পাগলামী বলে, তবে পাগলের কর্ম্মক্ষেত্রে সফলতা হইলে তাকে পাগল না বলিয়া প্রতিভাবান্ মহাপুরুষ বলে। আমার কর্ম্মক্ষেত্রে সফলতা দূরের কথা, সম্পূর্ণ ভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণও করিতে পারি নাই, অতএব আমাকে পাগলই বুঝিবে।"

* * * *

"পাগলকে বিবাহ করিয়াছ সে তোমার পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মদোষের ফল। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করা ভাল, সে কি রকম বন্দোবস্ত হইবে? পাঁচজনের মতের আশ্রয় লইয়া তুমিও কি ওকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবে? পাগল ত পাগলামীর পথে ছুটিবেই ছুটিবে, তুমি ওকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, তোমার চেয়ে ওর স্বভাবই বলবান।"

* * * *

"আমার তিনটী পাগলামী আছে। প্রথম পাগলামী এই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের, যাহা পরিবারের ভরণ-পোষণে লাগে আর

যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকি রহিল, ভগবানকে ফেরৎ দেওয়া উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, যে ভগবানের নিকট ধন লইয়া ভগবানকে দেয় না, সে চোর। এ পর্য্যন্ত ভগবানকে দুই আনা দিয়া চৌদ্দ আনা নিজের সুখে খরচ করিয়া হিসাবটা চুকাইয়া সাংসারিক সুখে মত্ত রহিয়াছি।… …পশুও নিজের ও নিজের পরিবারের উদর পূরিয়া কৃতার্থ হয়।

"আমি এতদিন পশুবৃত্তি ও চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া আসিতেছি ইহা বুঝিতে পারিলাম। বুঝিয়া বড় অনুতাপ ও নিজের উপর ঘৃণা হইয়াছে, আর নয়, সে পাপ জন্মের মত ছাড়িয়া দিলাম। ভগবানকে দেওয়ার মানে কি, মানে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করা।……পরোপকার ধর্ম্ম, আশ্রিতকে রক্ষা করা মহাধর্ম্ম,…। এই দুর্দ্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার ত্রিশ কোটী ভাই-বোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের হিত করিতে হয়।

"কি বল, এই বিষয়ে আমার সহধর্ম্মিণী হইবে? কেবল সামান্য লোকের মত খাইয়া পরিয়া যাহা সত্যি সত্যি দরকার তাহাই কিনিয়া আর সব ভগবানকে দিব, এই আমার ইচ্ছা, তুমি মত দিলেই, ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলেই আমার অভিসন্ধি পূর্ণ হইতে পারে।……

"দ্বিতীয় পাগলামী সম্প্রতিই ঘাড়ে চেপেছে, পাগলামীটা এই, **যে-কোন-মতে ভগবানের সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিতে হইবে।** আজকালকার ধর্ম্ম, ভগবানের নাম কথায় কথায় মুখে নেওয়া, সকলের সমক্ষে

প্রার্থনা করা, লোককে দেখান আমি কি ধার্ম্মিক! তাহা আমি চাই না। ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন-না-কোন পথ থাকিবে, সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মে বলে, নিজের শরীরের নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, একমাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্ম্মের কথা মিথ্যা নয়, যে-যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা তোমাকেও সেই পথে নিয়া যাই……।”

* * * * *

“তৃতীয় পাগলামী এই যে, অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্ব্বত নদী বলিয়া জানে; **আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি।** মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্ত পানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্ত ভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? **আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল।** ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে,

এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল।"

* * * * *

"এখন বলি তুমি এ বিষয়ে কি করিতে চাও? ... ... উদাসীন হইয়া স্বামীর শক্তি খর্ব্ব করিবে? না সহানুভূতি ও উৎসাহ দ্বিগুণিত করিবে?............আমরা বলি স্ত্রী স্বামীর শক্তি, মানে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার কাছে নিজের মহৎ আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি পাইয়া দ্বিগুণ শক্তি লাভ করে।"

১৯০৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিত অরবিন্দের আর একখানি পত্রও ঐরূপ ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত। ইহার এক স্থানে তিনি তাঁহার স্ত্রীকে লিখিতেছেন—"আমার এইবার মনের অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছে, সে কথা এই পত্রে প্রকাশ করিব না। তুমি এখানে এস, তখন যাহা বলিবার আছে তাহা বলিব; কেবল এই কথাই এখন বলিতে হইল যে, এর পরে আমি আর নিজের ইচ্ছাধীন নই, যেইখানে ভগবান আমাকে নিয়া যাইবেন সেইখানে পুতুলের মত যাইতে হইবে, যাহা করাইবেন তাহা পুতুলের মত করিতে হইবে।"

'বন্দেমাতরম্'-এর বীরত্বব্যাঞ্জক রচনা দেশে অসাধারণ শক্তি আনয়ন করিতেছে দেখিয়া সরকার ভীত হইলেন। অবশেষে বিপ্লববাদীদের মুখপত্র 'যুগান্তর'-এর একটি রচনার ইংরেজী অনুবাদ 'বন্দেমাতরম্'-এ প্রকাশিত হওয়ার অভিযোগে উক্ত পত্রিকার সম্পাদকরূপে অরবিন্দকে অভিযুক্ত করা হইল। 'যুগান্তর'-এ প্রকাশিত রচনাটির নাম "কাবুলি দাওয়াই'—অর্থাৎ, প্রয়োজন হইলে আত্মরক্ষার্থ শারীরিক শক্তির ব্যবহার

করা কর্ত্তব্য, এই ভাবটি উক্ত রচনায় প্রচারিত হইয়াছিল। 'বন্দেমাতরম্'-এর কর্ত্তৃপক্ষ এই মতবাদের স্বপক্ষে না হইলেও, তাঁহারা তদানীন্তন যুবকদের আদর্শকে অশ্রদ্ধা করিতেন না। তাঁহারা মনে করিতেন, ভীরুতা ও তামসিকতার অবসাদ হইতে দেশকে জাগ্রত করিতে হইলে প্রথমে রাজসিক ভাবের প্রয়োজন।

যাহা হউক, সরকার-পক্ষ বহু চেষ্টাতেও অরবিন্দকে 'বন্দেমাতরম্'-এর সম্পাদক বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলেন না। অরবিন্দকে অভিযুক্ত করিবার আইনত অসুবিধা বুঝিয়া তাঁহারা অন্যতম নেতা বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়কে সাক্ষীরূপে তলব করিলেন। কিন্তু এই প্রকার বিচারের দ্বারা আমলাতন্ত্র দেশের জনমতের পোষকতা না করিয়া উহাকে পদদলিত করিতে চাহেন, মনে করিয়া বিপিনচন্দ্র সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিলেন। ফলে, আদালত অবমাননার অপরাধে তাঁহার ছয়মাস অশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল।

বিচারের সময় অরবিন্দ সর্ব্বশেষে তাঁহার বক্তব্য বলিলেন, তৎপূর্ব্বে তিনি নির্ব্বাক ছিলেন, কোন প্রশ্নেরই উত্তর করেন নাই। এই জন্য তখন তাঁহাকে 'the silent man'—অর্থাৎ, 'নির্ব্বাক ব্যক্তি' আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। আমলাতন্ত্রের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল—নির্দোষ প্রমাণিত হইয়া অরবিন্দ কারামুক্ত হইলেন। এই সময় অরবিন্দ দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি যে কতদূর আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা কবি-গুরুর একটি বিখ্যাত কবিতায় অনুপম ভঙ্গীতে প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন যে, অরবিন্দ সাধারণ রাজনৈতিক নেতা মাত্র নহেন —তাঁহার চরিত্রবল ও অসাধারণ ত্যাগে মুগ্ধ হইয়াই কবিগুরু সেদিন নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি রচনা করিয়া অরবিন্দকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য প্রদানে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।—

শ্রীঅরবিন্দ

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণী-মূর্ত্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ; কোন ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোন ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি'
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি'
পরিপূর্ণতার তরে সর্ব্ববাধাহীন,—
যার লাগি' নর-দেব চির-রাত্রি-দিন
তপোমগ্ন; যার লাগি' কবি বজ্ররবে
গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে
গিয়াছেন সঙ্কট-যাত্রায়; যার কাছে
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে;
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয়;—সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার—
চেয়েছো দেশের হ'য়ে অকুণ্ঠ আশায়,
সত্যের গৌরব-দৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে। তোমার প্রার্থনা আজি
বিধাতা কি শুনেছেন? তাই উঠে বাজি'
জয়-শঙ্খ তাঁর? তোমার দক্ষিণ করে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে
দুঃখের দারুণ দীপ, আলোক যাহার
জ্বলিয়াছে, বিদ্ধ করি' দেশের আঁধার
ধ্রুব-তারকার মতো? জয়, তব জয়।

শ্রীঅরবিন্দ

কে আজি ফেলিবে অশ্রু, কে করিবে ভয়,
সত্যোরে করিবে খর্ব্ব কোন্ কাপুরুষ
নিজেরে করিতে রক্ষা? কোন্ অমানুষ
তোমার বেদনা হ'তে না পাইবে বল?
মোছ্ রে, দুর্ব্বল চক্ষু, মোছ্ অশ্রুজল।
দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র দূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে? বন্ধন-শৃঙ্খল তা'র
চরণ বন্দনা করি' করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা। রুষ্ট রাহু
বিধাতার সূর্য্য পানে বাড়াইয়া বাহু
আপনি বিলুপ্ত হয় মুহূর্ত্তেক পরে
ছায়ার মতন। শাস্তি? শাস্তি তা'রি তরে
যে পারে না শাস্তি ভয়ে হইতে বাহির
লঙ্ঘিয়া নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর,
কপট বেষ্টন; যে নপুংস কোনোদিন
চাহিয়া ধর্ম্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলেনি অন্যায়; আপনার
মনুষ্যত্ব, বিধিদত্ত নিত্য অধিকার
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভামাঝে; দুর্গতির করে অহঙ্কার;
দেশের দুর্দ্দশা ল'য়ে যার ব্যবসায়,
অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃরক্ত প্রায়;

সেই ভীরু নতশির, চিরশাস্তি তা'রে
রাজকারা বাহিরেতে নিত্য কারাগারে।

বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্ত্তি, কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান,
মহাতীর্থ-যাত্রীর সঙ্গীত, চির-প্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয় বাণী
উদার মৃত্যুর। ভারতের বীণা-পাণি
হে কবি, তোমার মুখে রাখি' দৃষ্টি তাঁর
তারে তারে দিয়াছেন বিপুল ঝঙ্কার,—
নাহি তাহে দুঃখ তান, নাহি ক্ষুদ্র লাজ,
নাহি দৈন্য, নাহি ত্রাস তাই শুনি আজ
কোথা হ'তে ঝঞ্ঝাসাথে সিন্ধুর গর্জ্জন,
অন্ধবেগে নির্ঝরের উন্মত্ত নর্ত্তন
পাষাণ পিঞ্জর টুটি'—বজ্র গর্জ্জরব
ভেরি মন্দ্রে মেঘপুঞ্জ জাগায় ভৈরব
এ উদাত্ত সঙ্গীতের তরঙ্গ মাঝার
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
তা'র পরে তাঁকে নমি যিনি ক্রীড়াচ্ছলে
গড়েন নূতন সৃষ্টি প্রলয় অনলে,
মৃত্যু হ'তে দেন প্রাণ, বিপদের বুকে
সম্পদেরে করেন লালন, হাসিমুখে

ভক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টক কান্তারে
রিক্ত হস্তে শত্রুমাঝে রাত্রি অন্ধকারে।
যিনি নানা কণ্ঠে কন্ নানা ইতিহাসে,
সকল মহৎ কর্ম্মে পরম প্রয়াসে,
সকল চরম লাভে, "দুঃখ কিছু নয়,
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব্ব ভয়;
কোথা মিথ্যা রাজা কোথা রাজদণ্ড তা'র;
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার।
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির,
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।"

৬

কারাবাস

বিপ্লববাদীদের মুখপত্র 'যুগান্তর'-এর উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। এখন ঐই বিপ্লবীদের ইতিহাস কিছু বলা প্রয়োজন। বাংলায় জাতীয় ভাবের নূতন স্রোত আসিয়াছিল, তাঁহার মধ্যে অরবিন্দ প্রমুখ নেতাগণ একটা নূতন উদ্দীপনা আনিয়াছিলেন। অরবিন্দের আদর্শে দেশের যুবকদল উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন। ক্রমে নূতন ভাবে মাতোয়ারা, সর্ব্বস্বত্যাগী বুদ্ধিমান একদল যুবক অরবিন্দের কনিষ্ঠভ্রাতা বারীন্দ্রের নেতৃত্বে দেশে একটি বিপ্লবের দল সৃষ্টি করেন। বারীন্দ্রের সহকর্মী বিপ্লবীদের অন্যতম নেতা উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 'যুগান্তর' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনা করিতেন। ঐ পত্রিকায় প্রায় প্রকাশ্যভাবেই সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবের আদর্শ প্রচার করা হইত।

এই যুবকগণ দেশের জন্য সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিয়া অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছিলেন। তাঁহারা অরবিন্দের ত্যাগের আদর্শ নিজেদের জীবনে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধি ও চরিত্র বলে সকলকে মুগ্ধ করিতেন। কিন্তু অরবিন্দ হইতে তাঁহাদের কর্ম্ম-প্রণালী পৃথক্ ছিল। তাঁহারা অরবিন্দের 'ব্রহ্মতেজের' বা 'জ্ঞানবলের' উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর না করিয়া শারীরিক বলের দ্বারা দেশে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল প্রতিভাশালী কর্ম্মঠ যুবক স্বাধীনতার আদর্শে এতদূর উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা সরকারের সতর্ক দৃষ্টি অধিককাল এড়াইতে পারিলেন না।

বিপ্লবীরা তদানীন্তন বাংলার লাটসাহেবের রেলগাড়ী তাঁহার ভ্রমণ-কালে 'ডিনামাইট' দিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হ'ন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলের শেষে এক দিন রাত্রিবেলা তাঁহারা ভ্রমক্রমে মজঃফর-পুরের জেলা জজ মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের গাড়ী মনে করিয়া একখানি গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করেন, ইহাতে দুইটি ইউরোপীয় মহিলার প্রাণনাশ হয়। মিঃ কিংস্‌ফোর্ড পূর্ব্বে কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন; ঐ-সময় তাঁহার বিচারে কয়েকজন বিপ্লবীর কারাদণ্ড হয়—ইহাই ছিল মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের উপর বিপ্লবিগণের আক্রোশের কারণ।

মে মাস আরম্ভ হইতেই কলিকাতায় খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তারের ধূম পড়িয়া গেল। সহরের এক প্রান্তে বোমার প্রধান আড্ডায় বিপ্লবী যুবকদলের অনেকেই গ্রেপ্তার হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় অরবিন্দকেও গ্রেপ্তার করা হইল। অরবিন্দের অপরাধ এই যে, তিনি স্বাধীনতার আদর্শ প্রকাশ্যে প্রচার করিতেন এবং বলিতেন, স্বাধীনতালাভের জন্য প্রকৃত স্পৃহা জন্মিলে প্রয়োজন হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হইবে। কিন্তু দেশের আমলাতন্ত্র অরবিন্দকেই এই বিপ্লববাদের বুদ্ধিদাতা ও প্রচ্ছন্ন নেতা বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে হত্যা, ডাকাতি প্রভৃতি হীন কার্য্যের অভিযোগ আনয়ন করিলেন।

গ্রেপ্তারের দিন—১লা মে—রাত্রিতে অরবিন্দ তাঁহার গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ীতে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছিলেন। ভোর পাঁচটার সময় তাঁহার ভগিনী সন্ত্রস্ত ভাবে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া তুলেন ও পুলিসের আগমনের সংবাদ দেন। তাহারা সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করে। প্রথমে তাঁহার হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু পরে তাহা খুলিয়া দেওয়া হয়। অরবিন্দকে

গ্রেপ্তার করিতে যে পুলিসবাহিনী তাঁহার গৃহে আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্রেগান সাহেব ছিলেন। অরবিন্দের শিক্ষাদীক্ষা, মহত্ত্ব বুঝিবার মত ক্ষমতা ক্রেগান সাহেবের ছিল না—তিনি অরবিন্দের গৃহে আসবাবপত্রের অভাব ও তাঁহার বেশভূষার সারল্য দেখিয়া অরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, "শুনিলাম আপনি বি-এ পাশ করিয়াছেন; এমন বাসায়, এইরূপ আসবাবশূন্য ঘরে মাটিতে শুইয়া থাকা কি আপনার ন্যায় শিক্ষিত লোকের পক্ষে লজ্জার কথা নয়?" উত্তরে অরবিন্দ বলিলেন, "আমি গরিব, গরিবের মতই বাস করি।" ক্রেগান তাঁহার স্থূলবুদ্ধির আরও পরিচয় দিয়া বলিলেন, "তবে কি আপনি ধনী হইবার জন্যই এই সব করাইয়াছেন?"

প্রায় সাড়ে ছয় ঘণ্টা খানাতল্লাসীর পর অরবিন্দকে থানায় লইয়া যাওয়া হইল। এখান হইতে তাঁহাকে যথাক্রমে লালবাজার ও রয়েড ষ্ট্রীটের পুলিস অপিসে লইয়া যাওয়া হয়। রয়েড ষ্ট্রীটে দুই-একজন গোয়েন্দা পুলিস অরবিন্দের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বোমার কোন সন্ধান পাওয়া যায় কি না বুঝিবার জন্য বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু অরবিন্দ ধর্ম্মপ্রবণ দার্শনিকজাতীয় লোক হইলেও মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি এই সকল গোয়েন্দার চাতুরী অতি সহজেই বুঝিতে পারিতেন। একজন গোয়েন্দা অনেকক্ষণ অরবিন্দের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতে করিতে হঠাৎ যেন কথাপ্রসঙ্গে সহানুভূতির সুরে বলিয়া ফেলিলেন, "আপনি আপনার ছোট ভাইকে বোমা তৈরীর জন্য বাগানটি ছাড়িয়া দিয়া বুদ্ধিমানের কাজ করেন নাই, খুবই ভুল করিয়াছিলেন।" অরবিন্দ তাঁহার কথার রহস্য বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বাগানে আমার ও আমার ভাইয়ের সমান অধিকার; আমি

যে তাহাকে বাগানটি ছাড়িয়া দিয়াছি বা ছাড়িয়া দিলেও বোমা তৈরীর জন্য ছাড়িয়াছি এমন কথা আপনি কোথায় শুনিলেন?" সুচতুর লোকটির ধর্ম্মালোচনা সে-দিনের মত আর চলিল না।

সন্ধ্যার পর অরবিন্দকে পুনরায় লালবাজারে আনা হইল। সেখানে পুলিস কমিশনার হ্যালিডে সাহেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এ-বিষয়ে অরবিন্দ তাঁহার 'কারাকাহিনী'তে লিখিয়াছেন—"আর সকলে যখন চলিয়া যায়, হ্যালিডে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এই কাপুরুষোচিত দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া আপনার কি লজ্জা করে না?' আমি বলিলাম, 'আমি লিপ্ত ছিলাম, ইহা ধরিয়া লইবার আপনার কি অধিকার?' উহার উত্তরে হ্যালিডে বলিলেন, 'আমি ধরিয়া লই নাই, আমি সবই জানি।' আমি বলিলাম, 'কি জানেন না জানেন আপনারাই অবগত, এই হত্যাকাণ্ডের সহিত সকল সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি।' হ্যালিডে আর কোন কথা বলিলেন না।"

২রা মে রাত্রি ও ৩রা মে দিবারাত্র অরবিন্দের হাজতে কাটিল। ৪ঠা মে তাঁহাকে কমিশনারের সম্মুখে হাজির করা হইল, কিন্তু তিনি কমিশনারের নিকট কিছু বলিতে সম্মত হইলেন না। পরদিন ৫ই মে তাঁহাকে ম্যাজিষ্ট্রেট থর্ণহিল সাহেবের এজলাসে লইয়া যাওয়া হয়। এখানে একজন আত্মীয়ের সহিত দেখা হইলে অরবিন্দ তাঁহাকে বলেন, "বাড়ীতে বলিও, তাহারা যেন কোনরূপ ভয় না করে; আমি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইব।" তখন হইতেই তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত হইবার সম্বন্ধে অরবিন্দের সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

থর্ণহিল সাহেবের কোর্ট হইতে অরবিন্দ গাড়ী করিয়া আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে নীত হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ নির্জ্জন কারাবাসের হুকুম দিলেন। তখন তাঁহাকে জেলে লইয়া গিয়া সেখানকার কর্ম্মচারী-দের তত্ত্বাবধানে রাখা হইল।

১৯০৮ সনের ৫ই মে আলিপুরে অরবিন্দের* কারাবাস আরম্ভ হয়। পরবৎসর ৫ই মে তিনি তাহা হইতে নিষ্কৃতি পান। এই সুদীর্ঘ এক বৎসর কাল অরবিন্দের বিচারের প্রহসন চলে। দোষী প্রতিপন্ন হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে একবৎসর কারাবাসে থাকিতে হইল। তাঁহার জন্য নির্জ্জন কারাবাসের ব্যবস্থা হইয়াছিল। নির্জ্জন কারাবাসের বিবরণ আজ আর দেশবাসীর অজ্ঞাত নাই। সুসভ্য ইংরাজ-সরকারের আধুনিক সভ্যতার এরূপ চমৎকার নিদর্শন আর অল্পই আছে।

অরবিন্দের কারাগৃহটি নয় ফুট দীর্ঘ, পাঁচ ফুট প্রস্থ ছিল। ইহাতে জানালা বা আসবাবপত্রের কোন বালাই ছিল না। ঐ একই ঘরকে "শোবার ঘর, খাবার ঘর ও পায়খানা" রূপে ব্যবহার করিতে হইত। একখানি থালা ও একটি বাটি ছিল অরবিন্দের আহার-বিহারের সম্বল। একই বাটিতে বন্দীকে শৌচক্রিয়া, মুখপ্রক্ষালন, স্নান, আহার, জলপান ও আচমন—সকল কাজই সারিতে হইত। প্রথমে অরবিন্দকে স্নানাদির জন্য জলকষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই, পরে তাহাও ভোগ করিতে হইয়াছিল। ঘরটিতে হাওয়া খেলিত না বলিলেই চলে। গ্রীষ্মের সময় দ্বিপ্রহরে উহা অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিত এবং সেই সময় ঐ গৃহস্থিত একটি টিনের বালতির অর্দ্ধ উষ্ণ জল পান করিয়া পিপাসা শান্তি করিতে হইত। ঐ বদ্ধ গৃহে বিছানা বলিতে ছিল জেলের তৈরী দুইটি মোটা কম্বল। বালিশ ছিল না, সুতরাং অরবিন্দ একটি কম্বল পাতিয়া শুইতেন

এবং অপরটিকে বালিশরূপে ব্যবহার করিতেন। বৃষ্টির দিন জলপ্লাবনে ঘরের প্রায় সমস্তটাই ভিজিয়া যাইত, তখন বন্দীকে ভিজা কম্বল হাতে লইয়া মেজে না শুকান পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইত।

অরবিন্দ পাশ্চাত্য দেশে বহুকাল কাটাইয়াছেন, এবং স্বদেশে অত্যন্ত সরলভাবে জীবনযাপন করিলেও এরূপ কৃচ্ছ্রসাধন পূর্ব্বে তাঁহাকে কখনও করিতে হয় নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে হয়ত নিজের জন্য সুবিধামত থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু এই সকল অসুবিধাকে অরবিন্দ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের সঙ্গে জেলে তাঁহার যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই, এজন্য তিনি বিরক্ত না হইয়া সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। জেলের সকল অসুবিধাগুলিকে তিনি তাঁহার সাধন-পথের সহায়স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জেলে অরবিন্দের নির্জ্জন কারাবাসের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই নির্জ্জন কারাবাস কিছুদিন পরে তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। এই দুঃসহ অবস্থার বর্ণনা করিয়া অরবিন্দ লিখিয়াছেন, "একদিন অপরাহ্নে আমি চিন্তা করিতেছিলাম, চিন্তা আসিতেই লাগিল, হঠাৎ সেই চিন্তাসকল এমন অসংযত ও অসংলগ্ন হইতে লাগিল যে, বুঝিতে পারিলাম চিন্তার উপর বুদ্ধির নিগ্রহ-শক্তি লুপ্ত হইতে চলিল। তাহার পর যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন মনে পড়িল যে, বুদ্ধির নিগ্রহ-শক্তি লুপ্ত হইলেও বুদ্ধি স্বয়ং লুপ্ত বা একমুহূর্ত্তও ভ্রষ্ট হয় নাই, বরং শান্তভাবে মনের এই অপূর্ব্ব ক্রিয়া যেন নিরীক্ষণ করিতেছিল। কিন্তু তখন আমি উন্মত্ততা-ভয়ে ত্রস্ত হইয়া ইহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। প্রাণপণে ভগবানকে ডাকিলাম, আমার বুদ্ধিভ্রংশ নিবারণ করিতে বলিলাম। সেই মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত অন্তঃকরণে

হঠাৎ এমন শান্তি প্রসারিত হইল, সমস্ত শরীরময় এমন শীতলতা ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, উত্তপ্ত মন এমন স্নিগ্ধ, প্রসন্ন ও পরম সুখী হইল যে পূর্ব্বে এই জীবনে এমন সুখময় অবস্থা অনুভব করিতে পারি নাই। শিশু মাতৃক্রোড়ে যেমন আশ্বস্ত ও নির্ভীক হইয়া শুইয়া থাকে আমিও যেন বিশ্বজননীর ক্রোড়ে সেইরূপ শুইয়া রহিলাম। এইদিনই আমার কারাবাসের কষ্ট ঘুচিয়া গেল।"

এই সময় গীতার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া তিনি তদনুযায়ী সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন—তাঁহার ধর্ম্ম-সাধনা গভীরভাবে চলিতে লাগিল। জেলের প্রত্যেক পদার্থে তিনি ব্রহ্মের প্রকাশ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেন। মঙ্গলময় ভগবান তাঁহার মঙ্গলের জন্যই যে তাঁহাকে কারাবাসে আনিয়াছেন, তাহা তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। এই সম্পর্কে তিনি পরে বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"আমি জানিতাম যে, আমি নির্ম্মুক্ত হইব। এই এক বৎসরের কারাবাসের জীবনে আমার নির্জ্জন-বাসও শিক্ষার কাজ করিয়াছে। ভগবানের ইচ্ছায় না হইলে কাহার শক্তি আমাকে কারাবাসে রাখে? তিনি আমাকে একটা সাড়া দিবার জন্য পাঠাইয়াছেন—একটা মহৎ কাজ করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন, সে বার্ত্তা ঘোষিত না হইলে, সে কাজ সম্পাদিত না হইলে মানবশক্তির সাধ্য কি আমাকে বদ্ধ করিয়া রাখে?"

অরবিন্দ ও অন্যান্য বোমার আসামীদের বিচার আদালতে আরম্ভ হইল। অরবিন্দ বিচার সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করিতেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তিনি নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইয়া কারামুক্ত হইবেন। সরকার পক্ষে মিঃ নর্টন ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইলেন। অরবিন্দের দোষ প্রমাণিত করিবার জন্য মিঃ নর্টন তাঁহার বাক্‌চাতুর্য্য ও

ব্যারিষ্টারী বুদ্ধিমত্তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অরবিন্দের পক্ষে মিঃ সি, আর, দাশ (চিত্তরঞ্জন দাশ) ব্যারিষ্টাররূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন তখনও দেশ-সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া 'দেশবন্ধু' হ'ন নাই; তখন তিনি উদীয়মান ব্যারিষ্টাররূপে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তখন তাঁহার সময় বিশেষ মূল্যবান। কিন্তু দেশভক্ত অরবিন্দের নির্যাতন সেদিন সুখক্রোড়ে থাকিয়াও চিত্তরঞ্জন নীরবে সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি অর্থলাভের আশা ত্যাগ করিয়া অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনের জন্য উপস্থিত হইলেন। এই বিচার সম্বন্ধে অরবিন্দের পূর্ব্বে কথঞ্চিৎ চিন্তা থাকিলেও চিত্তরঞ্জনকে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে দেখিয়া তাহাও দূর হইল।

বিচারে অন্যান্য আসামীদের দ্বীপান্তর প্রভৃতি দণ্ড হইল, কিন্তু দীর্ঘ একবৎসর কারাবাসের পর অরবিন্দ নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিলেন। অরবিন্দের দোষ প্রমাণের জন্য পুলিশের সহায়তায় মিঃ নর্টন অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনরূপ যুক্তিপূর্ণ সাক্ষ্য বা প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারিলেন না। শেষে বিখ্যাত 'Sweets letter' বাহির হইল। এই পত্রখানিতে অরবিন্দ বারীন্দ্রকে দেশময় 'Sweets' অর্থাৎ 'মিষ্টান্ন' বিতরণ করিতে লিখিয়াছেন বলিয়া সরকার পক্ষ ইহাকে প্রমাণে ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পত্রেরও সুবিধামত প্রমাণ মিলিল না। চিত্তরঞ্জনের অক্লান্ত চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে মিঃ নর্টনের সকল যুক্তিজাল অপসারিত হইল। বিচারপতি মিঃ বীচ্‌ক্রফ্‌ট্‌ ও এসেসরগণ (Assessors) সকলেই অরবিন্দকে নির্দ্দোষ বুঝিয়া মুক্তি দিলেন। এই মিঃ বীচ্‌ক্রফ্‌ট্‌ বিলাতে অরবিন্দের সহাধ্যায়ী ছিলেন। একই বৎসর তাঁহারা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

গ্রীকভাষার পরীক্ষায় অরবিন্দ প্রথম স্থান ও মিঃ বীচ্‌ক্রফ্‌ট্‌ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তাহারই আঠার বৎসর পরে স্বাধীন দেশের সন্তান মিঃ বীচ্‌ক্রফ্‌ট্‌ হইলেন আলিপুরের সেসন জজ আর অধীন দেশের সুসন্তান অরবিন্দ তাঁহারই সম্মুখে আসামীর বেশে উপস্থিত হইলেন।

যাহা হউক, ১৯০৯ সালের ৫ই মে তারিখ অরবিন্দ মুক্তিলাভ করিলেন। তাঁহার বিচারকালে চিত্তরঞ্জনের অভিভাষণ অতি সুন্দর, যুক্তিপূর্ণ ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মানুবাদ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে প্রদত্ত হইল।

অরবিন্দের বিচার প্রসঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অভিভাষণ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—তৎকালের মিঃ সি, আর, দাশ—বিশেষ আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিয়াও বিচারের সময় অরবিন্দের পক্ষাবলম্বন করিয়া উপস্থিত হ'ন। বলা বাহুল্য, তিনি পরম বিচক্ষণতা ও তৎপরতার সহিতই এই কার্য্য সম্পাদন করেন। বিচারের শেষভাগে তিনি বিচারপতি ও এসেসরগণের (Assessors) প্রতি যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা এ-দেশের ফৌজদারী বিচারের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে এবং থাকিবে। ইহাতে মিঃ দাশ গভীর পাণ্ডিত্য, অন্তর্দৃষ্টি ও সহানুভূতির সহিত অনবদ্য ভাষায় অরবিন্দের চিন্তাধারা ও কার্য্যাবলীর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। নিম্নে উহার মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল।—

এতদিন পরে এই বিচারের কাজ যে প্রায় শেষ হইয়া আসিল, ইহা আমাদের সকলেরই পক্ষে আনন্দের বিষয়। কারারুদ্ধ বন্দিগণের পক্ষে ইহা বিশেষভাবে আনন্দের বিষয়, কারণ তাহারা প্রায় এক বৎসর কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। ভদ্রমহোদয়গণ, যে সমস্ত সাক্ষ্য ইহাদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত হইয়াছে, সেই সমস্ত শুনিয়া ইঁহারা প্রকৃতই অপরাধী কিনা আপনাদিগকে এখন তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই মোকদ্দমার সাক্ষ্য আমাকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিতে হইবে, কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে ইহার কতকগুলি বিশেষত্বের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—সে বিশেষত্বগুলি নিতান্তই অসাধারণ। আমার

মনে পড়িতেছে, মিঃ বার্লি (Mr. Birley) তাঁহার সাক্ষ্যের একস্থানে বলিয়াছেন যে, তিনি এই মোকদ্দমাটিতে বিশেষ বা কিছুটা অসাধারণ মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন—কারণ ইহাকে তিনি একটি অসাধারণ মোকদ্দমা বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন—এবং প্রদত্ত সাক্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেই আপনারাও বুঝিতে পারিবেন যে, এই মোকদ্দমাটির বিচারও পূর্ব্বাপর অস্বাভাবিক রকমে চালিত হইয়াছে। বর্ত্তমান আদালতে যাহা ঘটিয়াছে তাহার বিষয়ে আমি তেমন-কিছু বলিতেছি না—মামলাটি দায়রা সোপর্দ্দ হইয়া এই স্থানে আসিবার পূর্ব্বে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট যাহা যাহা ঘটিয়াছিল বিশেষভাবে আমি তাহারই কথা উল্লেখ করিতেছি। সেই স্থলেই ইহার বীজ বপিত হয়। আপনারা দেখিতে পাইবেন, আসামিগণ কেবলমাত্র সন্দেহবশে গ্রেপ্তার হইলেও মিঃ বার্লি ৩রা মে তারিখেই তাঁহাদের বিচার করিবেন বলিয়া মনস্থ করেন। আসামীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য এই যে, পুলিস তাঁহাদের কয়েক জনকে বোমা তৈরী ও ষড়যন্ত্রের অপরাধে অল্প-বিস্তর অপরাধী বলিয়া মনে করে। সেই সাক্ষ্য সত্য কি মিথ্যা, তাহার কথা এখন নাই তুলিলাম। পুলিস বলিয়াছে যে, ২রা মে এই আসামীদের সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় আনা হয় এবং হাজতে রাখা হয়। তাহাদের কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় নাই; তবে পুলিসের মতে স্বয়ং পুলিস কমিশনারই হয়ত একজন ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তাঁহার সম্মুখে আসামীদের উপস্থিত করিয়াই হয়ত পুলিস তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছে। এদিকে ৩রা মে তারিখেই আমরা দেখিতে পাই যে, মিঃ বার্লি আসামীদের বিচার করিবার জন্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ৪ঠা মে তারিখে আসামীদের তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। আমরা

জানি, মিঃ বার্লি তৎপূর্ব্বেই একজন বিশেষ উচ্চপদস্থ পুলিস কর্ম্মচারীর গৃহে যান এবং তথায় আসামীরা পুলিসের কাছে যে সব স্বীকারোক্তি করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, তাহার কিছু কিছু পাঠ করেন। আমার মতে ইহা একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার এবং এইরূপ ব্যাপার ইহার পূর্ব্বে কোন মোকদ্দমায়—কোন আদালতে আমরা ঘটিতে দেখি নাই। ইহার পর তিনি কি করিলেন? ৪ঠা মে তাঁহার সম্মুখে কয়েকজন আসামীকে উপস্থিত করা হয়। তিনি তাঁহাদের পরীক্ষা করিবার জন্য প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ফরিয়াদীপক্ষ বলেন যে, তিনি আইনের একটি বিশেষ ধারা অনুযায়ী আসামীদের স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করিব এবং মিঃ বার্লি যে-সব প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহা হইতেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, আরও কোন্ কোন্ লোক এই ব্যাপার বিশেষে জড়িত আছে ইহা জানাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ইহা ৪ঠা মের কথা। ৩রা মে তিনি এই মোকদ্দমার বিচার করিবেন বলিয়া কৃতনিশ্চয় হ'ন, ৪ঠা মে তারিখে আসামীদের তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এবং তাঁহার নিকট কিছুমাত্র প্রমাণ প্রয়োগের পূর্ব্বেই তিনি স্বয়ং প্রশ্ন করিয়া তদুত্তরে আসামীদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। ইহার পরে তিনি জামিনের জন্য আবেদনগুলির দিকে দৃষ্টি দেন—অনেকগুলি আবেদন আসিয়াছিল—প্রায় সকল আসামীই পর পর আবেদন করেন। সেগুলি সবই নামঞ্জুর করা হয়। পরে ১৮ই মে মিঃ ফ্রিজোনির (Mr. Frizoni) পরীক্ষা দ্বারা মিঃ বার্লির সম্মুখে সাক্ষ্য-গ্রহণের কাজ আরম্ভ হয়। আপনারা জানেন, সেইদিনই এই মোকদ্দমার বিচার সম্পর্কে তাঁহার অধিকার সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপিত হয়। ইহার পরদিনই মিঃ বার্লি হুকুম-নামায় (order sheet) কেন

তাঁহাকে স্বয়ং এই মোকদ্দমাটি বিচারার্থ গ্রহণ করিতে হয় তাহা বিবৃত করিতে যাইয়া নিজের ৩রা তারিখের হুকুমের কথার উল্লেখ করেন। ইহা আর একটি বিসদৃশ ব্যাপার।

১৮ই মে ক্রিজোনির সাক্ষ্য আংশিকভাবে গ্রহণ করা হয়। ১৯-এ মে মিঃ বার্লি যে হুকুম (order) দেন আমি তাহা আপনাদের নিকট পাঠ করিব। সেই সাক্ষ্য সম্বন্ধীয় কোন দলিল এখানে উপস্থিত করা হয় নাই। কিন্তু মিঃ বার্লি মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি আদালতের উপযুক্ত অনুমতি ব্যতীত এই ব্যাপারটি হস্তে লইয়াছেন বলিয়া আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। সেইজন্য তিনি আবার নূতন করিয়া ক্রিজোনির সাক্ষ্য লইতে আরম্ভ করেন—ইহাতেই আইনের মর্য্যাদা রক্ষিত হইল বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিয়া থাকিবে। ইহাই কি একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার নিয়ম? আমার বক্তব্য এই যে, ক্রিজোনির সাক্ষ্যের মধ্যে ঐ-সব অবান্তর বিষয় ঢুকাইবার উদ্দেশ্য হইতেছে, মিঃ বার্লির নিজের পক্ষে এই মোকদ্দমার বিচার করিবার আইনতঃ যে বাধা রহিয়াছে (legal objection to his jurisdiction) তাহা দূর করা, কারণ এই বাধা তিনি পূর্ব্বে দূর করিতে পারেন নাই বলিয়াই তাহার বিশ্বাস ছিল।

স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ১৮ই মের পূর্ব্বে তাঁহাকে এই মোকদ্দমা বিচারের কোন অধিকারই প্রদত্ত হয় নাই এবং ইহাও সত্য যে, অনুমতি পাইয়াও তিনি ফরিয়াদীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই, যাহা আইনতঃ তাঁহার অবশ্য করা উচিত ছিল। আপনাদের নিকট আমার ইহাই নিবেদন যে, এই সকল ব্যবস্থাই নিতান্ত বিসদৃশ হইয়াছে। এইরূপ কার্য্যাবলী ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের বা অপর কোন আইনের কোন ব্যবস্থা দ্বারাই সমর্থিত হইতে পারে না। মিঃ বার্লির ফৌজদারী কার্য্য-

বিধি আইনের প্রতি অশ্রদ্ধার কারণ আমি ভালরূপই বুঝিতে পারি, কিন্তু আমি বেশ জোরের সঙ্গেই বলিতে পারি যে, এই আইন রাজবন্দীদের বিচারের (state trial) সময়েও প্রযুজ্য এবং যে বিচারে কোন লোক ঐ আইনের সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধে অভিযুক্ত সে বিচারে উহা বিশেষভাবেই প্রযুজ্য। সমস্ত সাক্ষ্য পর্য্যালোচনা করিয়া আমি আপনাদের দেখাইব যে, ইহার অধিকাংশই গ্রহণযোগ্য নয় (inadmissible) এবং ইহার মধ্যে শতকরা নব্বইটি সাক্ষ্যই আসামীরা যে অপরাধে অভিযুক্ত তাহার সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণ দেয় না। ইহাতে কেবল যে সাধারণের অর্থ এবং সময়েরই অসদ্ব্যবহার হইয়াছে তাহা নহে, উপরন্তু ঐ রাশি রাশি সাক্ষ্য দ্বারা আসামীদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইবারও বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

এই জাতীয় মোকদ্দমায় প্রথমে একটি ষড়যন্ত্রের বিদ্যমানতা প্রমাণ করা দরকার, তৎপরে অভিযুক্তদের ঐ ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত থাকা প্রমাণ করা আবশ্যক। কিন্তু আমার বন্ধু, সরকারপক্ষের কৌন্সিলি মিঃ নর্টন, কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন? তিনি প্রথমেই ধরিয়া লইয়াছেন যে, ইহারা অপরাধী —তারপর তিনি সাক্ষ্যের সহিত ইহাদের জড়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একখানি পত্রে তিনি A. G. নামক ব্যক্তিবিশেষের উল্লেখ দেখেন। তখন তিনি কি যুক্তি প্রয়োগ করেন? তিনি কি কোন প্রমাণ দেখাইয়াছেন যে A. G. মানে অরবিন্দ ঘোষ? তাহা দেখান নাই—কিন্তু তাঁহার যুক্তি এই- 'আমি আপনাদের বলিতেছি, এই A. G.-ই অরবিন্দ ঘোষ।' তাঁহার মতে আসামীদের বিচার করিতে হইলে প্রথমেই আপনাদের ধরিয়া লইতে হইবে যে, আসামীরা অপরাধী এবং পরে তাহাদের বিরুদ্ধে কি সাক্ষ্য আছে তাহা দেখিতে হইবে।

ছাত্র-ভাণ্ডারের কথা ধরা যাউক। ছাত্র-ভাণ্ডারের সহিত অরবিন্দ ঘোষের সম্পর্ক আছে, অতএব তিনি একজন ষড়যন্ত্রকারী। আমি বলি—এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করাই ভুল—এবং এই প্রকার পদ্ধতি পূর্ব্বে কোনদিন কোন বিচারালয়ে অবলম্বিত হয় নাই। আপনাদিগকে তাঁহার বলা উচিত ছিল যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এই ধারণা লইয়া আপনারা বিচারে প্রবৃত্ত হউন—পরে সাক্ষ্য-প্রমাণাদির দ্বারা আপনারা যদি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন যে, তাঁহাদের অপরাধের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইলেই আপনারা তাঁহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারেন।

এই স্থলে আর একটি কথা বলিবার আছে, তাহা অরবিন্দের পারিবারিক চিঠিপত্রের সম্বন্ধে। এই চিঠিগুলি পড়িলে আপনারা দেখিতে পাইবেন, আসামীদের বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আনা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে চিঠিগুলিতে কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। ব্যক্তিগত গোপনীয় চিঠিপত্র সম্বন্ধেও সাধারণ ভদ্রতার সীমা নিতান্ত অন্যায় ও যথেচ্ছভাবে লঙ্ঘন করা হইয়াছে। এই সব লোকেরা অপরাধী ইহা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যেই কি ঐরূপ করা হইয়াছে? আমি বলি, তাহা নহে। যে-সব অভিযোগে আসামীরা অভিযুক্ত হইয়াছেন, এই সকল চিঠির কোথায়ও তাহার সম্বন্ধে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। আমার বন্ধুবরের যুক্তি সেখানেও ঐ একইরূপ—'চিঠির উপরে উপরে পড়িলে হইবে না, উহার ভিতরকার রহস্য বুঝিতে হইবে।'—অর্থাৎ, যদিও চিঠিগুলিতে ষড়যন্ত্রের সমর্থক কিছুই পাওয়া যায় না, বা উহাতে কোনরূপ অপরাধেরও আভাসমাত্র নাই, তথাপি তাহাতে প্রতারিত হইলে চলিবে না। অরবিন্দ যে অপরাধী তাহা কি আপনারা জ্ঞাত নন? বোমা তৈরীর সঙ্গে যে

তিনি জড়িত ইহা কি আপনারা জানেন না? তিনি যে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাও কি আপনারা জানেন না? এই সব মানিয়া লইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, অরবিন্দ অপরাধী। বোমার ষড়যন্ত্র সম্পর্কেই তিনি বরোদায় কাজ-কর্মে লিপ্ত ছিলেন—এইরূপ বলা হইয়াছে। 'বন্দেমাতরম'-এ প্রকাশিত তাঁহার রচনাবলীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি যে 'বন্দেমাতরম'-এর সকল লেখার জন্যই দায়ী, সে-সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণই দেখান হয় নাই। রচনা-গুলি স্বাধীনতার ভাবে অনুপ্রাণিত। আমার বন্ধু তাঁহার বক্তৃতার প্রারম্ভেই বলিয়াছেন যে, সে-সকল আদর্শের বিরুদ্ধে কোন ইংরেজই আপত্তি উত্থাপন করিবেন না। আমি আবারও বলিতেছি যে, অরবিন্দ ঐ-সকল লেখার আদ্যোপান্ত স্বাধীনতার আদর্শই প্রচার করিয়াছেন এবং সে আদর্শের সহিত যে কোন ইংরেজের বিরোধিতা নাই তাহাও আমরা বারম্বার শুনিয়াছি। এই যুক্তির মধ্যেও কি সেই একই ভ্রম নাই যে, অরবিন্দ অপরাধী ইহা প্রথমেই ধরিয়া লইতে হইবে, তারপর তাঁহার প্রবন্ধাদি পাঠ করিতে হইবে।—তাঁহার লেখায় তিনি ঐ আদর্শগুলি প্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ লেখার মধ্য হইতেই বোমার ও যুদ্ধের ষড়যন্ত্রের কথা আপনাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে। বন্ধুবর তাঁহার সকল যুক্তিতেই এই একই ভ্রম করিয়াছেন।

আমি আপনাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, অরবিন্দের চিঠিপত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে, ভদ্রমহোদয়গণ, তাঁহার সমস্ত জীবনই আপনাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে। আমার বন্ধু মিঃ নর্টন বলিতেছেন যে, অরবিন্দের ব্যক্তিগত জীবনের গুরুতম ঘটনাবলী সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা হইতেই আপনারা

ষড়যন্ত্র ও রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অভিপ্রায় পাইবেন। আমিও ঐ-সকল চিঠিপত্র ও প্রমাণের উপরেই একান্ত বিশ্বাসে নির্ভর করিব এবং আপনাদের দেখাইব যে, অরবিন্দ সমগ্র জীবনে—তাঁহার প্রথম কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রেপ্তার হওয়ার দিন পর্যন্ত—মহৎ আদর্শের দ্বারাই প্রণোদিত হইয়াছেন। অরবিন্দের বরোদায় অবস্থান কালে লিখিত যে-সব চিঠিপত্র তাঁহার অপরাধ প্রমাণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে ও সংবাদপত্রে বা বক্তৃতামঞ্চে অরবিন্দ যে বাণী প্রচার করিয়াছেন, আমি প্রমাণ করিব যে, তাহাতে কোথায়ও সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মানসে কোনরূপ ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিতমাত্রও নাই। তদপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্যই তাঁহাকে চিরকাল কর্মে অন্তঃপ্রেরণা দিয়াছে। আপনারা লক্ষ্য করিবেন' ১৯০৪ সালের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার গ্রেপ্তার হওয়ার অল্পদিন পূর্ব পর্যন্ত বরাবরই সেই মহত্তর আদর্শ তাঁহার কর্মে প্রেরণা জোগাইয়াছে। এই মোকদ্দমার মূল বিষয়ের আলোচনা করিবার পূর্বে ঐ-সকল আদর্শ সম্বন্ধে আপনাদিগকে কিছু বলিলে তাহা অবান্তর হইবে না আশা করি। বন্ধুবর মিঃ নর্টন তাঁহার অভিভাষণের আগাগোড়াই ইহার সম্বন্ধে বিদ্রূপ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, কিন্তু তাহাতে আমার কিছুই যায় আসে না। জাতির সম্বন্ধে অরবিন্দ স্বাধীনতারূপ উচ্চ আদর্শের বাণী প্রচার করিয়াছেন, ব্যক্তিগত মানুষের ক্ষেত্রে সেই আদর্শে পৌঁছান এবং নিজের ভিতরে ভগবানের সাক্ষাৎলাভই তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা। এই আদর্শ আমাদের দেশে আদৌ নূতন নহে। যাহারা এই আদর্শের সঙ্গে পরিচিত নয়, তাহাদের পক্ষে ইহা বুঝা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের নিকটে ইহা সুপরিচিত।

বেদান্তের শিক্ষা এই যে, মানুষ ভগবান হইতে পৃথক নহে, অর্থাৎ

যদি তুমি আপনাকে উপলব্ধি করিতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে তোমার অন্তরস্থ ভগবানের সন্ধান লইতে হইবে। তোমার অন্তঃকরণ ও তোমার আত্মার মধ্যেই ভগবান বিরাজ করিতেছেন এবং ব্যক্তিগতভাবে মানুষ যেমন অন্তরস্থিত ভগবানকে উপলব্ধি না করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে না, তেমনি জাতির (nation) ক্ষেত্রেও বলা যায় যে, কোন জাতি তাহার অন্তর্নিহিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মহত্তম সামগ্রীটিকে না চিনিলে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারে না। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মানুষ বাহিরের সাহায্যে ভগবানকে উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহার নিজের একান্ত চেষ্টা ব্যতীত অন্তরস্থ ভগবানকে উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয় না ; জাতির ক্ষেত্রেও তাহাই সত্য। কোন জাতিকে উন্নতিলাভ করিতে হইলে নিজের চেষ্টাতেই তাহা করিতে হইবে। বিদেশীয় কেহ আসিয়া তোমাকে সে মুক্তি দিতে পারে না। সেই জাতীয়তার ভাব পুনরুজ্জীবিত করিবার ক্ষমতা তোমার নিজের হাতেই রহিয়াছে। এই জাতীয়তার আদর্শই অরবিন্দ বরাবর প্রচার করিয়াছেন এবং এই আদর্শকে আমাদের দেশের সংস্কারের (tradition) বিরোধী নয় এইরূপ কোন উপায় দ্বারাই কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। আমি এই বিষয়ের প্রতি আপনাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। দেশের পূর্ব্বাপর ইতিহাস এবং সংস্কারের বিরুদ্ধ পথে সেই মুক্তি লাভ করিতে হইবে, এমন কথা অরবিন্দ বলেন নাই—ইহা তাঁহার মত নহে। সেইজন্যই বরোদা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া অরবিন্দ যে বাণী প্রচার করিয়াছেন তাহা হিংসার বাণী নহে, তাহা নিরুদ্ধ প্রতিরোধের (Passive resistance) বাণী। বোমা চাই না, চাই ত্যাগ—চাই দেশের জন্য দুঃখভোগ। গুপ্তসমিতি ও হিংসার পথকে তিনি নিন্দা করিয়াছেন এবং সকলকে দুঃখ কষ্ট বরণ

করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। যদি এমন কোন আইন থাকে যাহা অন্যায় ও জাতির উন্নতির পথে অন্তরায় স্বরূপ, তবে তাহা অবশ্যই লঙ্ঘন করিবে এবং তাহার ফলাফল মানিয়া লইবে।—সংবাদপত্রে বা বক্তৃতামঞ্চে কোথায়ও কখনও তিনি বলপ্রয়োগের কথা বলেন নাই। সরকার যদি মুক্তিলাভের বিঘ্নস্বরূপ কোন আইন প্রণয়ন করেন, তাহা হইলে আবশ্যক মত তাহা লঙ্ঘন করাই, অর্থাৎ অমান্য করাই অরবিন্দের উপদেশ। ইহার জন্য তুমি তোমার বিবেকের কাছে, তোমার দেবতার কাছে দায়ী। যদি আইন বলে, জেলে যাইতে হইবে, যাও, জেলে যাও। অরবিন্দ-প্রচারিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ইহাই মর্মকথা। এই একই ভিত্তির উপরে কি সমগ্র পৃথিবীতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের বাণী প্রচারিত হয় নাই; মিঃ নর্টন এই আন্দোলনকে গালাগালি দিতে কসুর করেন নাই—কিন্তু এই আন্দোলন কি বিশেষ করিয়া কেবল এখানেই দেখা দিয়াছে? ইংলণ্ডের লোক কি বারম্বার এই পথই অবলম্বন করে নাই? যেদিন ঐ হাতকড়া অরবিন্দের হাতে পরানো হইয়াছে সেদিন পর্য্যন্ত তিনিও ঐ একই বাণী প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার দেশ আত্মবিশ্বাস হারাইয়া সকলই হারাইতে বসিয়াছে দেখিয়া অরবিন্দের মন নৈরাশ্যের অবসাদে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য যেখানেই তিনি স্বাধীনতার কথা বলিয়াছেন, সেখানেই তিনি ঐ একটি কথার উপরই বিশেষ জোর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আপনার শক্তিকে বিশ্বাস কর, আত্মশক্তিতে আস্থাবান না হইলে কেহই মুক্তিলাভ করিতে পারে না। জাতির ক্ষেত্রেও তিনি ঐ একই কথা বলিয়াছেন। যদি কোন জাতি (nation) উপলব্ধি না করে যে, তাহার নিজের মধ্যে এমন একটি সামগ্রী আছে যাহা-দ্বারা সে স্বাধীনতা ও মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সে জাতির

কোন আশা নাই। এইজন্যই অরবিন্দ প্রচার করিয়াছেন, "তোমরা ভীরু নও, তোমরা একটা অপদার্থ জাতি নও, কারণ তোমাদের মধ্যে দৈবীশক্তি রহিয়াছে। আত্মপ্রত্যয় লাভ কর এবং সেই প্রত্যয়ের বলে লক্ষ্যাভিমুখ অগ্রসর হইয়া একটি আত্মোন্নত জাতিতে পরিণত হও।"

*　　*　　*　　*

আমি বাংলা চিঠিখানি আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইতে চাহি ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, সে-সময় অরবিন্দ ভাল বাংলা জানিতেন না। চিঠিখানি সংস্কৃতের ধরণে লেখা আপনাদের 'অন্ধরাজার মহিষী'র কথা অবশ্যই মনে আছে। এই কথাটির পশ্চাতে একটি কাহিনী আছে, সেটি এই,—রাণী গান্ধারী তাঁহার স্বামী ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন বলিয়া নিজের চক্ষু বাঁধিয়া রাখিতেন। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা দেখিতেছেন, অরবিন্দ নিজেকে 'পাগল' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার স্ত্রী কোন পথে চলিবেন তাঁহাকে তাহা স্থির করিতে বলিতেছেন। তিনি গান্ধারীর কথা উল্লেখ করিয়া এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে যখন হিন্দুর রক্ত বহমান, তখন অরবিন্দের পথেই যেন তিনি চলেন। জীবনের যে পথ তিনি বাছিয়া লইয়াছেন, সেইপথই তিনি একান্তভাবে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। জীবন ধারণের জন্য যাহা প্রয়োজন শুধু তাহাই রাখিয়া এই মানুষটি তাহার আয়ের প্রায় সমস্ত টাকা দেশের মঙ্গলের জন্য ও দানকার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন। এই পত্রের প্রথমেই যে মহান ভাবটির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা এই যে, তাঁহার মতে তাঁহার টাকা

কড়ির কিছুরই তিনি মালিক নহেন, তিনি সংরক্ষক (Trustee) মাত্র। নিজের জীবন ধারণের জন্য যৎসামান্য কিছু ব্যয় করিয়া সমস্ত উদ্বৃত্ত অর্থ ভগবানের চরণে সমর্পণ করাই তাঁহার কর্তব্য। ভগবানকে সমর্পণ করা কিরূপে সম্ভব হয়? ভগবানের কাজ করিয়া তাহা সম্ভব হয়—অর্থাৎ ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করিয়া এবং অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করিয়া। কেবল এই ভাবেই ভগবানের সামগ্রী ভগবানকে ফিরাইয়া দেওয়া যায়। যে মানুষ ইহা করে না সে চোর। ইহা তাহার স্বার্থসিদ্ধির সহায় হইবে বলিয়া তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। ঐরূপ জীবন যাপন করিবার জন্য তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। নিজের ভরণপোষণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় সামান্য অর্থ রাখিয়া আর সমস্তই তিনি ভগবানকে প্রত্যর্পণ করিবেন। দান করিয়া—ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করিয়া ও দুঃস্থকে সাহায্য দান করিয়াই তাহা করা সম্ভবপর হয়।

ইহার পরে চিঠিতে তিনি আর একটি আদর্শের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সেটি তাঁহার মনের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভগবানকে দেখা যায়—চক্ষে দেখা নহে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত পথে ভগবানকে মানস-চক্ষে দেখা। নিজের অন্তরস্থ ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়।—এই ভাবটিকে বিদ্রূপ করা সহজ, কিন্তু অরবিন্দে আমরা সেইরূপ একটি মানুষকে দেখিতে পাই, যিনি ভগবানকে স্বয়ং উপলব্ধি করিবার একান্ত আগ্রহকে ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। এইটি তাঁহার দ্বিতীয় মহান্ আদর্শ। আর একটি কথা আছে—এই চিঠিতে গুরুর সম্বন্ধে একটি প্রচ্ছন্ন উল্লেখ রহিয়াছে।

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা জানেন যে, মন্ত্রগ্রহণ করিলে হিন্দুগণ তাঁহাদের গুরুর সম্বন্ধে কোন কথা বা এমন কি মন্ত্রগ্রহণের কথাও

কাহাকেও বলেন না। ইহা হিন্দুধর্ম্মের একটি অঙ্গ। গুরুর আদেশ ব্যতিরেকে ইহা স্ত্রীর নিকটেও প্রকাশ করা যায় না। "যাইবার নিয়ম দেখাইয়াছেন", অর্থাৎ যে পথে চলিলে অন্তরস্থ ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় সেই পথে চলিবার নিয়মাবলী সম্বন্ধে কেহ উপদেশ দান করিয়াছেন। তারপর তিনি তাহা অভ্যাস আরম্ভ করিলেন—অর্থাৎ ঐ সকল নিয়মানুযায়ী তিনি নিজ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

পরে তিনি বলিয়াছেন, "সেই সকল নিয়ম পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, একমাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্ম্মের কথা মিথ্যা নয়, যে-যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি।" "সেই পথে সিদ্ধি সকলের হইতে পারে, কিন্তু প্রবেশ করা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।" তাঁহার স্ত্রী এই পথে যাইতে ইচ্ছা করেন কিনা এই পত্রে অরবিন্দ তাঁহাকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কারণ তদনুসারে পরে তিনি ইহার সম্বন্ধে আরও কিছু লিখিতে পারিবেন।—এই কথাটি আপনারা মনে রাখিবেন, কারণ আমার বন্ধু অরবিন্দের পরবর্ত্তী যে-সব পত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলিতে এই কথাটি পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

তারপর তিনি তাঁহার তৃতীয় আদর্শটির কথা বলিয়াছেন। এইখানে তিনি তাঁহার স্বদেশপ্রেমের উৎস কোথায় তাহার সন্ধান দিয়াছেন। এস্থলেও বেদান্ত হইতে ভাবটি গ্রহণ করা হইয়াছে। আপনারা জানেন যে, সমস্ত জগৎ ব্রহ্মের প্রকাশ (manifestation), ইহাই বেদান্তের বাণী। সমস্তই ভগবানের প্রকাশ বলিয়া যদি না বুঝিতে পারা যায়, যতক্ষণ না অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, চারিদিকের পৃথিবী এবং স্বদেশ ঈশ্বরেরই প্রকাশমাত্র—ততক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্তই মায়া, অসত্য।

কিন্তু যখনই বুঝিতে পারিবে যে, সৃষ্টি ভগবান হইতে পৃথক্ নহে, বরং তাঁহারই অংশ ও প্রকাশ, সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে আর অসত্য বা মায়া বলিয়া মনে হয় না, তাহা সত্য হইয়া উঠে। "তুমি তোমার স্বদেশকে কি বলিয়া জান? তোমার স্বদেশ কতগুলা মাঠ, পর্ব্বত, নদী মাত্র নয়...।" অরবিন্দের কাছে স্বদেশ মাতার ন্যায়। হিন্দুধর্ম্মের মতে ইহা ভগবানেরই অন্য একটি রূপ। তাঁহার স্বদেশপ্রেমের মূলসূত্র ইহাই বলে যে, স্বদেশকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে—তাহাকে মাতৃরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। স্বদেশকে এমন করিয়া ভালবাসিতে হইবে যেন ইহাকে মনপ্রাণে ভগবানেরই একটি রূপ বলিয়া অনুভব করিতে পারা যায়। যে বেদান্তে বিশ্বাস করে, সে এই ভাবটি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারে। তাহার স্বদেশপ্রেমের মূলে ইহাই রহিয়াছে। উপরন্তু আমাদের স্বাদেশিকতা আমাদিগকে বিশ্বমানবতার দিকে লইয়া না গেলে তাহার কোন মূল্য নাই বলিয়াই অরবিন্দের বিশ্বাস। সকল জাতি সেই পথে উন্নতিলাভ না করিলে আমরা কখনও মনুষ্যত্বের আদর্শে পৌঁছিতে পারিব না। সমাজের আদর্শানুযায়ী যেমন মানুষকে ব্যক্তিগত ভাবে চলিতে হয়, সেইরূপ সমস্ত মনুষ্যজাতির আদর্শানুযায়ী প্রত্যেক জাতিকে চলিতে হইবে, নতুবা আমাদের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানই সম্পূর্ণ অর্থহীন—'বন্দেমাতরম্'-এর বহু প্রবন্ধ হইতে আমি এই ভাবটি আপনাদিগকে দেখাইব। অরবিন্দ স্বদেশ-মাতাকে মাতা বলিয়াই মনে করেন—উহা তাঁহার নিকট ভগবানের একটি রূপমাত্র।

তারপর তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার লক্ষ্য স্বাধীনতা। তাঁহার জীবিতকালে সে আদর্শ সার্থক না হইতে পারে, কিন্তু একদিন তাহা সফল হইবেই। "মা'র উপর অত্যাচার হইলে তাঁহার ছেলেরা

কি করিবে ?........." এই কথাটির বিরুদ্ধে একটি অদ্ভুত যুক্তি উত্থাপিত হইয়াছে। কি উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব, তাহা তিনি বলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—দেশ একদিন স্বাধীনতা লাভ করিবেই, ইহাই তাঁহার আদর্শ। তাহার পন্থা কি ? তিনি এই পন্থাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে।" .... এই পত্রগুলি পড়িলে আপনারা অবশ্য বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি অন্য প্রকার শক্তিকে হেয় বলিয়া মনে করেন। তিনি একমাত্র জ্ঞানবলেরই উপর নির্ভর করেন এবং তাহারই সাহায্য লইয়া থাকেন। তাঁহার মতে ব্রহ্মতেজ বা জ্ঞান-বলের উপরই দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। অরবিন্দ বন্দুক ও তরবারির উপর নির্ভর করেন, বন্ধুবর এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই উপহসনীয়। যে-কেহ পত্রগুলি পড়িলেই নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারিবে যে, তিনি দৈহিক শক্তিকে দেশোদ্ধারের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই—চরিত্রবলকে, জ্ঞানবলকে তাহার উপায় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন—তাহারই উপর দেশের ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিবে। তিনি বলিয়াছেন, "মনে করিও না, যে, শারীরিক বলই পৃথিবীতে একমাত্র বল,—জ্ঞানবল, চরিত্রবল তদপেক্ষা মহত্তর। উহার উপর নির্ভর কর—দেশের মুক্তির জন্য ঐ পন্থা অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য।" আমার সুবিজ্ঞ বন্ধু ঐ পত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা কোন প্রকারেই উহার প্রকৃত ব্যাখ্যা হইতে পারে না।

পত্রের একস্থানে আছে "মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে ?"—ইহার অর্থ কি ? ইহা একটি উপমা মাত্র। তিনি বলিয়াছেন, "অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্ব্বত নদী বলিয়া জানে,

আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি।" তারপরই তিনি দেশের পরাধীনতার উল্লেখ করিয়াছেন। একটি উপমা দিয়া তিনি দেশবাসীকে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে নিষেধ করিয়াছেন ; তাহাদের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য কাজ করিতে হইবে। পত্রখানি প্রকাশার্থ লিখিত হয় নাই, দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়াও তিনি এই পত্রখানি লিখেন নাই, ইহা তিনি তাঁহার স্ত্রীকে লিখিয়াছেন। উহার অর্থ এইরূপ নহে কি যে, দেশের দুরবস্থা দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, দেশে স্বাধীনতা নাই, দেশ দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ? সুতরাং দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীরই কর্ম্মঠ হওয়া কর্ত্তব্য। স্বদেশ তাঁহার মাতা,—এই ভাবটিই তাঁহার দেশপ্রেমের মূলে রহিয়াছে। তাঁহার নিকট তাঁহার স্বদেশ একটি অসার জড়পদার্থ মাত্র নহে—তাঁহার নিকট ইহা ভগবানেরই বাস্তব রূপ (concrete manifestation)। চরিত্র ও জ্ঞান-বলের দ্বারাই দেশের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে, শারীরিক বলের দ্বারা নহে—ইহাই তাঁহার পত্রের মূল কথা।

ভদ্রমহোদয়গণ, 'স্ত্রী স্বামীর শক্তি' তাঁহার এই কথাটির তাৎপর্য্য কি তাহা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারেন। ঈশ্বরকে অরবিন্দ শক্তি-স্বরূপ মনে করেন এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যেও ঐ শক্তির বিকাশ অনুভব করিয়া তিনি বলিয়াছেন, স্ত্রী শক্তিস্বরূপিণী। ঐ শক্তিস্বরূপিণীর সাহায্যেই তিনি স্বামী ও স্ত্রীর উচ্চতর সম্বন্ধে উপনীত হইয়াছেন।

"তুমি কি সাহেব-পূজা-মন্ত্র জপ করিবে?"—তাঁহার কথাটির দ্বারা অরবিন্দ বলিতে চাহেন, তুমি কি পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসরণ করিবে?" পাশ্চাত্য আদর্শের অনুসরণ যাহারা করে, তিনি তাহাদের নিন্দা করিয়াছেন।

"এই ছিল সেই গোপনীয় কথা"—তিনি সেই গোপন কথাটি পত্রে ব্যাখ্যা করিয়া স্ত্রীর সহযোগিতা চাহিয়াছেন। অরবিন্দ স্ত্রীকে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে—ভগবানকে ধ্যান করিতে বলিয়াছেন, কেন না তাহা হইলে তিনি এই সমস্ত কথা বুঝিতে পারিবেন। পত্রখানিতে ইহা ছাড়া আর বিশেষ কোন কথা নাই। স্ত্রীর স্বভাবের ত্রুটি দেখাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, সেগুলি বর্তমান কালেরই দোষ। তারপর তিনি লিখিয়াছেন, আজকাল সব বড় আদর্শকেই উপহাস করা হয়।

মাননীয় বিচারপতি মহাশয়কে আমি ১৯০৫ সালের ৩০এ আগষ্ট তারিখের পত্রখানি দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। এই পত্রখানিতে অরবিন্দ কোনরূপ শারীরিক বল প্রয়োগের কথাই বলেন নাই। বরং লেখক সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্ম-তেজেরই উপর নির্ভর করিয়াছেন। আপনারা পরে দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহার সমস্ত কাজের মধ্য দিয়া তিনি কেবল মাত্র এই ব্রহ্ম-তেজ প্রয়োগের কথাই প্রচার করিয়াছেন। ব্রহ্ম-তেজের দ্বারা স্বদেশের উদ্ধার সাধনকে এই মানুষটি তাঁহার আদর্শ ধর্মের অঙ্গস্বরূপ মনে করেন। এখন আপনারা বিচার করুন এই মানুষটির কি অভিপ্রায় ছিল। রাজতন্ত্র বা গণতন্ত্র কোন শাসন-পদ্ধতিই যে জনসাধারণের সম্মতি ব্যতিরেকে স্থায়ী হইতে পারে না রাজনীতির এই সত্যটি এই সম্পর্কে আপনাদিগকে স্মরণ করিতে বলি। হব্‌স্ (Hobbes) হইতে স্পেনসার (Spencer) পর্যন্ত সকল রাজনীতিবিদই ইহা প্রচার করিয়াছেন। সরকার (Government)-বিশেষের অস্তিত্বই প্রমাণ করিয়া দেয় যে, জনসাধারণের তাহাতে সম্মতি আছে। অরবিন্দ প্রচার করিয়াছেন, ব্রহ্মতেজসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারাই দেশের মুক্তি সম্ভবপর হইবে। আমার বক্তব্য এই, অরবিন্দ মনে করেন যে, লোকের চিন্তাধারার পরিবর্তন

না হইলে তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিবেন না, সেই জন্যই প্রথমে তিনি স্বাধীনতাকে আদর্শরূপে প্রচার করিয়াছেন। তিনি মুক্ত কণ্ঠেই বলিয়াছেন, ইহা বর্ত্তমানের কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবিতকালে সফল হইতে পারে না। কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌছিবার পূর্ব্বেই দেশের লোক-দিগকে অন্ততপক্ষে ঐ-বিষয়ে শিক্ষিত করিয়াও তুলিতে হইবে।

কলিকাতা আসিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি কি কি উপায় অবলম্বন করিলেন? তিনি জাতীয় শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সকল প্রকার কাজকর্ম্মের মধ্যেও—গ্রেপ্তারের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও তিনি বরাবরই জাতীয় শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। স্বদেশের জাতীয় শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভবিষ্যতের আশা-ভরসা—সবই বিসর্জ্জন দিয়াছেন। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের কার্য্যে যোগদান করিয়া সেখানকার একটি উচ্চপদ তিনি গ্রহণ করেন। তিনি স্বদেশী ও বিলাতীবর্জ্জন (Boycott) আন্দোলনেও যোগদান করেন। এ-সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা এইরূপ—দেশের লোক দেশকে ভালবাসিতে শিখিলেই স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধনে অবশ্য আগ্রহান্বিত হইবে। 'স্বদেশী'র সম্বন্ধে অরবিন্দের মত এই যে, ইহা কেবল শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কীয় ব্যাপারই নহে। 'স্বদেশী' ও বিলাতীবর্জ্জন আন্দোলনের সহিত অরবিন্দের সম্পর্ককে আমি কেবলমাত্র শিল্প-বাণিজ্যের দিক্ হইতেই সমর্থন করিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহার আদর্শের এইরূপ ব্যাখ্যা করা অসঙ্গত হইবে। আমার প্রধান বক্তব্য এই যে, দেশের পুনরুদ্ধার ও নব-জীবনই তাঁহার একমাত্র কাম্য এবং তাঁহার মূলে রহিয়াছে ধর্ম্ম। কেবল দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে বা শিক্ষার উন্নতিকল্পেই তিনি 'স্বদেশী', বিলাতীবর্জ্জন ও জাতীয় শিক্ষার পৃষ্ঠ-পোষকতা করেন নাই—দেশবাসীর

প্রাণে জাতীয় ভাবের উদ্বোধনের পক্ষে এইগুলিকে তিনি উপায়স্বরূপ মনে করেন। ইহাই তাঁহার কার্য্য-পদ্ধতি। এই বিষয় সম্পর্কিত দলিল-পত্রাদি লইয়া আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আপনাদিগকে আমি দুইখানি পত্র দেখাইব—এই পত্র দুইখানি হইতে আপনারা কিছু নূতন তথ্যের সন্ধান পাইবেন। একখানি পত্র ১৯০৫ সালের ৩০-এ আগষ্ট তারিখের, অন্যখানি ১৯০৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের। প্রথম পত্রখানি হইতে সমস্ত ব্যাপারটির দুইটি দিকের সন্ধান মিলিবে। আমার বন্ধু একখানি পত্রের কথা উল্লেখ করেন নাই, আমি তাহারও উল্লেখ করিব। এই পত্রখানি ১৯০৮ সালের ২০-এ ফেব্রুয়ারী তারিখের।

* * * *

পত্রখানিতে আছে—"অনেকদিন চিঠি লিখি নাই—৪ঠা জানুয়ারী আসিবার কথা ছিল আসিতে পারি নাই,.........। যেখানে ভগবান নিয়া গিয়াছেন সেইখানে যাইতে হইল। এইবার আমি নিজের কাজে যাই নাই, তাঁহারই কাজে ছিলাম।"

তিনি কোথায় গিয়াছিলেন তাহা এই পত্র হইতেই বুঝা যায়। বিচারকালে অনেক সাক্ষীই এই পত্রের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাবলী পাঠ করিলেও বুঝা যায়, তিনি কি কি কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। আমার বক্তব্য এই যে, তাঁহার সমস্ত কর্ম্মেরই প্রাণ হইতেছে ধর্ম্ম।

আমার বিজ্ঞ বন্ধুবর বোধ হয় মনে করিয়াছেন, অরবিন্দ তাঁহার বর্ণনা-পত্রে (Statement) নিজেকে রাজনৈতিক কার্য্যের সহিত সম্পূর্ণরূপে বিযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি বলিয়াছেন, "রাজনীতি, ধর্ম্ম বা অন্য যে-কোন ক্ষেত্রেই আমি কাজ করি না কেন,

সকল ক্ষেত্রেই আমি আমার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়াছি।" রাজ-নৈতিক কার্য্যের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই এ-কথা বলা দূরে থাকুক, অরবিন্দ নিজেঃ স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি রাজনৈতিক কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন। অরবিন্দকে ভুল বুঝিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা বন্ধুবরের আছে। তাঁহার অভিভাষণে (address) একটি অতি চমৎকার কথা তিনি বলিয়াছেন। পত্রমধ্যে অরবিন্দের চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কথা আছে; আমার বন্ধু সে-সম্বন্ধে কি-যেন বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ কথার গতি ফিরাইয়া বলিলেন, 'Sweet's letter, বা মিষ্টান্ন সম্বন্ধীয় পত্র-খানির জন্যই অরবিন্দের মতের পরিবর্ত্তন হয়। তার পর তিনি হঠাৎ যেন আবার ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া বলিলেন, তাঁহার বক্তব্য এই যে, অরবিন্দ পূর্ব্বাপরই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। মিষ্টান্ন সম্বন্ধীয় পত্রখানির সঙ্গে অরবিন্দের কার্য্যকলাপের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের সম্পর্ক থাকা বিষয়ে তিনি পূর্ব্বে যে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন তাহা তিনি ছাড়িয়াই দিলেন।

পত্রখানিতে আছে "আমার এইবার মনের অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছে,......এর পরে আমি আর নিজের ইচ্ছাধীন নই, যেইখানে ভগবান আমাকে নিয়া যাইবেন সেইখানে পুতুলের মত যাইতে হইবে, যাহা করাইবেন তাহা পুতুলের মত করিতে হইবে।" ইহা হইতে অরবিন্দের বিশ্বাস যে ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর হইতেছে তাহা মাননীয় বিচারপতি মহাশয় বুঝিতে পারিবেন। এই বিষয়ে হিন্দুদিগের চিন্তাধারা [illegible] পথে গিয়াছে তাহা আপনারা বেশই অবগত আছেন। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংস ও অন্যান্য সাধুদের বাক্যগুলির প্রতি বিচারপতি মহা-শয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। হিন্দুধর্ম্মের সার কথা 'তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র',—নিজেকে কৃতকর্ম্মের কর্ত্তা মনে করিলে তাহার অন্যথাচরণ করা হয়।

১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্রে এই ভাবেরই কথা রহিয়াছে। অরবিন্দ তাঁহার স্ত্রীকে লিখিতেছেন, "তুমি মনে করিবে, আমি তোমাকে উপেক্ষা করিয়া বাজ করিতেছি, তাহা মনে করিবে না......এখন আমার আর স্বাধীনতা নাই, এর পর তোমাকে বুঝিতে হইবে যে, আমার সব কাজ আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া ভগবানের আদেশেই হইল।" এই সম্পর্কে গীতার 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি' —অর্থাৎ হে ভগবান, তুমি হৃদয়ের মধ্যে আছ, তুমি আমাকে যে রূপে নিয়োজিত করিবে, আমি সেইরূপই কাজ করিব—বাক্যটি আপনাদিগকে স্মরণ করিতে বলি।

পত্রখানিতে আছে—"আশা করি ভগবান আমাকে তাঁহার অপার করুণার যে আলোক দেখাইয়াছেন, তোমাকেও দেখাইবেন, কিন্তু সে তাঁহারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।" ইহা দ্বারা কি বুঝায় যে, তিনি তাঁহার স্ত্রীকেও ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে বলিতেছেন? ইহাতে কি বোমার কথা বলা হইয়াছে? ইহাদ্বারা তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাসের আরম্ভই সূচিত হইতেছে। স্বামীর ধর্ম্মানুষ্ঠানে স্ত্রীর স্বামীকে সাহায্য করা উচিত। উল্লিখিত পত্রে অরবিন্দ 'সহধর্ম্মিণী' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি হিন্দু আদর্শানুযায়ী স্ত্রীকে 'সহধর্ম্মিণী' বলিয়াছেন। আমি বলি, এই পরিবর্ত্তন হইতেই অরবিন্দের ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ। অরবিন্দ লিখিতেছেন, "প্রথমে আর কিছু করিতে হইবে না—কেবল রোজ আধঘণ্টা ভগবানকে ধ্যান করিতে হয়, তাঁর কাছে প্রার্থনারূপে বলবতী ইচ্ছা প্রকাশ করিতে হয়। মন ক্রমে ক্রমে তৈয়ারি হইবে। তাঁর কাছে সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করিতে হয়, আমি যেন স্বামীর জীবন, উদ্দেশ্য ও ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথে ব্যাঘাত না করিয়া সর্ব্বদা সহায় হই, সাধনভূত হই। এটা করিবে?"

পত্রের অন্য স্থানে আছে, "এই পত্র কাহাকেও দেখিতে দিবে না, কারণ যে কথা বলিয়াছি, সে অতিশয় গোপনীয়। তোমা ছাড়া আর কাহাকেও বলি নাই, বলা নিষিদ্ধ।"—কোন লোক 'মন্ত্র' লইলে গুরুর অনুমতি ব্যতীত তাহা কাহাকেও, এমন কি স্ত্রীকেও, বলা নিষিদ্ধ। অরবিন্দ লিখিয়াছেন, বিষয়টি গোপনীয়। আমি বলিতেছি যে, এই পত্রের ভাষাকে যতই টানিয়া টুনিয়া অর্থ করা হউক না কেন, ইহার তাৎপর্য্য অন্য কিছুই হইতে পারে না। তিনি বলিতেছেন, "তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও বলি নাই, বলা নিষিদ্ধ।"—কেন? যদি ইহা ষড়যন্ত্র সম্পর্কীয় কোন কথা হইত, তবে ষড়যন্ত্রকারীরা ইহা অবশ্য জানিত। সরকার পক্ষ 'বলা নিষিদ্ধ'র অনুবাদ করিয়াছেন—'I have been specially forbidden to disclose it' (আমাকে ইহা প্রকাশ করিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করা হইয়াছে)। এই অনুবাদ সঠিক হয় নাই। "It is not allowable" বলিলে ইহার ঠিক অনুবাদ করা হইবে। ৩০-এ আগষ্টের পত্রে কেবলমাত্র ধর্ম্ম-আলোচনাই রহিয়াছে। বিষয়-কর্ম্মের কথার জন্য তিনি তাঁহার স্ত্রীকে ভগিনী সরোজিনীর নিকট লিখিত পত্র দেখিতে বলিয়াছেন। কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া তিনি নিশ্চয় মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীকেও তাঁহার পথে প্রবর্ত্তিত করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন।

১৯০৫ সা[illegible] বারীন বরোদায় গমন করেন। সুবিজ্ঞ বন্ধুবর বলিয়াছেন, এই [illegible]ই বিপ্লবের বীজ বপন করা হয়। Ex. 286-3 চিহ্নিত পত্রখানি অরবিন্দ কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন। এই পত্র হইতে প্রথমেই বুঝা যায় যে, তিনি কলিকাতার রাজনীতির সঙ্গে তখনও পর্য্যন্ত জড়িত হন নাই। সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপী যে স্বদেশী

আন্দোলন তখন চলিতেছিল, তখন তিনি কেবল তাহার কথাই জানিতেন, বাংলার রাজনীতি সম্বন্ধে তখন তাঁহার কিছুই জানা ছিল না পত্রখানির পরের দিকে আছে, "স্বদেশী আন্দোলনের জন্য অনেক টাকা আমার ব্যয় করিতে হইয়াছে। আর একটি আন্দোলনের কথা আমার মনে মনে আছে, তাহার জন্য অজস্র অর্থের প্রয়োজন।"

কিন্তু এই আন্দোলনটি কিসের? ইহাই বোমার আন্দোলন—আমার বিজ্ঞ বন্ধু এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা কি তখনই আরম্ভ হইয়াছিল? ইহা কি ১৯০৫ সালে আরম্ভ হইয়াছিল? অরবিন্দ যে নূতন আন্দোলনটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেটি বোমার আন্দোলন নহে। দেশদেশান্তরব্যাপী বেদান্তধর্ম্মের আন্দোলন করাই অরবিন্দের উদ্দেশ্য ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষে কেন, সমগ্র পৃথিবীতে এই আন্দোলনটি ছড়াইয়া দেওয়া অরবিন্দের অভিপ্রেত ছিল। তিনি একজন বৈদান্তিক এবং তাঁহার সমস্ত কাজের মূলেই রহিয়াছে বেদান্ত-ধর্ম্ম। তাঁহার জীবনের মূলনীতি (principle) অনুযায়ী এই আন্দোলনটি আরম্ভ করিবার কথা তিনি চিন্তা করিতেছিলেন। বেদান্তের বাণী যে ভারতবর্ষের বাহিরেও প্রচার করা সম্ভব, ইহা কল্পনা মাত্র নয়, তাহা আপনারা অবশ্য স্মরণ রাখিবেন বেদান্তের বাণী ইতিমধ্যেই আমেরিকায় পৌঁছিয়াছে, ইংলণ্ডেও পৌঁছিয়াছে, কিন্তু আমেরিকার মত এখনও সেখানে তেমন স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই আমার বন্ধু বলেন, এই পত্রের তারিখের কিছুদিন পরেই বোমার আন্দোলন কলিকাতায় আরম্ভ হয়। 'আন্দোলন' শব্দটি পাইলেই উনি মনে করেন যে, ইহা নিশ্চয়ই বোমার আন্দোলন। এই পত্রখানির বিষয়ে মাননীয় বিচারপতি মহাশয়কে আর অধিক কিছু বলা অনাবশ্যক মনে করি।

এখন প্রশ্ন এই, অরবিন্দ কখন কলিকাতায় আসেন? ১৯০৬ সালের মে

মাসের কোন সময়ে অরবিন্দ কলিকাতায় আসেন,এবং পরে আবার বরোদায় ফিরিয়া যান। এই তারিখটি নির্দ্ধারণ করা বিশেষ প্রয়োজন। অরবিন্দ তাঁহার শ্বশুর মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, সেখানি এই। পত্রখানি ৮ই জুন কলিকাতা হইতে লেখা হইয়াছে। ইহাতে আছে, "আপনি যদি মৃণালিনীকে কলিকাতায় পাঠাইতে চাহেন, আমার আপত্তি নাই। বারীন অসুস্থ; আমি তাহাকে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য শিলং যাইতে বলিতেছি। সে গেলে আপনি নিশ্চয়ই তাহার যত্ন করিবেন। বারীন কিছুটা খামখেয়ালা ধরণের। বাড়ীতে থাকিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি করা তাহার দরকার, কিন্তু তাহা না করিয়া মাঝে মাঝে অকারণে ঘুরিয়া বেড়াইতেই সে খুব ভালবাসে। এ বিষয়ে তাহাকে বাধা দিয়া লাভ নাই, আমি বুঝিয়াছি। তাহাকে বাধা দিলে সে হয়ত আরো বিগ্‌ড়াইয়া যাইবে।"

বন্ধুবর এই পত্রখানির সদ্ব্যবহার করিয়া বলিয়াছেন যে, অরবিন্দ অত্যন্ত স্নেহশীল ভ্রাতা।

৩ই জুলাই অরবিন্দ বরোদায় ছিলেন। ৬ই জুলাই হইতে আগষ্টের মধ্যে লিখিত আর তেমন প্রয়োজনীয় পত্র নাই। দাখিলী দলিলের প্রথম পুস্তকখানির ২৫৪ পৃষ্ঠার নিম্নে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, অরবিন্দকে চাকুরীজীবী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই দলিলখানির তারিখ,১৯০৬ সালের ১লা আগষ্ট। চিঠিপত্রাদির প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, অরবিন্দ ঐ তারিখে কলিকাতায় ছিলেন।

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ১লা আগষ্টের অল্পদিন পূর্ব্বে অরবিন্দ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি আর বরোদায় ফিরিয়া যান নাই। তিনি নিশ্চয়ই পদত্যাগপত্র পাঠাইয়া থাকিবেন। ইতিমধ্যে

'জাতীয় বিদ্যালয়' (National College) সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। বন্ধুবর ১৯০৬ সালের আগষ্ট হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত সময়কে একটি বিশেষ কর্ম্মতৎপরতার যুগ ("period of great activities") বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সময়েই অরবিন্দ 'জাতীয় বিদ্যালয়ের' অধ্যক্ষ হন এবং 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকাও এই সময়ে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'বন্দেমাতরম্' কোম্পানীর তিনি যে অন্যতম পৃষ্ঠপোষক (Promoter) ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; 'ছাত্রভাণ্ডার'-এর প্রতিষ্ঠাও এই সময়ে হয়। তাঁহার যাহা-কিছু কাজকর্ম্ম এই তিনটিতেই পর্য্যবসিত বা সীমাবদ্ধ ছিল। আমি প্রমাণ করিব যে, তাঁহার সঙ্গে 'ছাত্রভাণ্ডার'-এর বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। উহার বিজ্ঞপ্তিপত্রে (Memorandum of Association) তিনি কেবল সাক্ষীরূপে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ইহা একটি বাহ্য কেতা (formal matter মাত্র।

'বন্দেমাতরম্' ও 'জাতীয় শিক্ষাপরিষদ' এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই তিনি জড়িত ছিলেন। তিনি 'বন্দেমাতরম'-এর সম্পাদক ছিলেন, ইহার সত্যতা আমি কিছুমাত্র স্বীকার করি না। কিন্তু ইহার সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ছিল না, তাহাও আমি বলিতেছি না; লেখকরূপে ইহার সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল।

বন্ধুবর 'ছাত্রভাণ্ডার'-এর কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ষড়যন্ত্রের ইহা একটি অঙ্গস্বরূপ। অরবিন্দের সহিত ইহার সম্পর্ক ছিল, অথবা অরবিন্দ একজন ষড়যন্ত্রকারী, সুতরাং 'ছাত্রভাণ্ডার' ষড়যন্ত্রের অঙ্গরূপ। এখন প্রশ্ন এই যে, অরবিন্দ কি সত্যই একজন ষড়যন্ত্রকারী? তাঁহার সহিত 'ছাত্রভাণ্ডার'-এর যোগ আছে এইরূপ দোষারোপ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হইয়াছে। 'ছাত্রভাণ্ডার'-এর বিজ্ঞপ্তি-পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, অরবিন্দ তাহাতে সাক্ষীরূপে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন।

বন্ধুবর বলিয়াছেন,—এই প্রতিষ্ঠানটি একটি লিমিটেড কোম্পানী। ইহার অনুষ্ঠান-পত্র (Articles of Association) ইত্যাদি লোকের চক্ষে ধূলি দিবার কৌশলমাত্র। উহা প্রকৃত ঘটনার পরিচায়ক নহে। তাঁহার যুক্তি এই যে, ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন রাখিবার জন্যই ইহাকে একটি লিমিটেড কোম্পানীরূপে স্থাপন করা হয়।

(এই স্থলে মিঃ নর্টন বলেন,—"আমি তাহা কখনও বলি নাই।")

তাহা হইলে আমার বুদ্ধির স্থূলতাবশতঃই বোধ হয় আমি সুবিজ্ঞ বন্ধুবরের কথা বুঝিতে পারি নাই। তিনি সত্য সত্যই বলিয়াছেন যে, প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন রাখিবার জন্য ইহা আবরণ মাত্র। দেখা যাক এই কোম্পানীর বিজ্ঞপ্তি-পত্র ও অনুষ্ঠান পত্র হইতে কি প্রমাণ হয়। ইহাতে আছে ব্যবসায়ী হিসাবে ক্রয়-বিক্রয়, আমদানী, রপ্তানী এবং খুচরা ও পাইকারী সকল প্রকার সাধারণ কারবার করিবার জন্য এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইল। ..."D" চিহ্নিত অংশের প্রতি লক্ষ্য করিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন, কোনরূপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সহিত ইহার কিছুমাত্র সংশ্রব নাই। ইহাকে কোনরূপ ষড়যন্ত্র বলিয়াও মনে হয় না।......বাহিরের লোকের ইহার অংশীদার হওয়ার পক্ষে কোনরূপ বাধাও নাই। তথাপি আমার বিজ্ঞ বন্ধুর ধারণা, 'ছাত্রভাণ্ডার' জঘন্য মতলব ঢাকিয়া রাখিবার কৌশলমাত্র।

বন্ধুবর বলিয়াছেন, 'ছাত্রভাণ্ডার'-এর উদ্দেশ্যই ছিল ষড়যন্ত্রকে সাহায্য করা। ইহার লাভের শতকরা চল্লিশ টাকা অংশীদারদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে

হইবে, এবং শতকরা ত্রিশ টাকা তত্ত্বজ্ঞান-মূলক কার্য্যে (philosophic work) ব্যয়িত হইবে। পোক্ত নিয়মটি লক্ষ্য করিয়া বন্ধুবর বলিয়াছেন, ঐ অর্থই অসদুদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হইত।

এ-দেশে যাঁহারা লিমিটেড কোম্পানী অথবা নিজেদেরই কোন বৃহৎ ব্যবসায় পরিচালনা করেন তাঁহাদের মধ্যে লভ্যাংশের কিছু অংশ সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যয় করিবার রীতি প্রচলিত আছে। এই প্রথাটি অতি সুন্দর। এমন কি সামান্য দোকানদাররাও যাহা হউক কিছু পৃথক করিয়া রাখে; তাহারা ইহাকে "বৃত্তি" বলে।

(এ স্থানে মিঃ নর্টন প্রশ্ন করেন—'ইহা কি একটি যুক্তি হইল?')

আমাদের দেশে ইহা একটি সাধারণ প্রথা—আমি কি ইহা উল্লেখ করিতে পারি না? মাননীয় বিচারপতি মহাশয় বোধ হয় অনেক দেওয়ানী মামলায় এই প্রথাটির পরিচয় পাইয়াছেন। দোকানদাররা প্রায়ই তাহাদের লভ্যাংশের সামান্য কিছু রাখিয়া দেয় এবং তাহা দাতব্য কর্ম্মে ব্যয় করে। সোদপুরের পিঁজরাপোল নামক বিরাট প্রতিষ্ঠানটি মাড়োয়ারীরা এই উপায়েই বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন—সেইখানেই বিচারক মহাশয় তাঁহার অকেজো ঘোড়া পাঠাইয়া থাকেন।

আমি বলিতে চাই, নিজেদের পাপ উদ্দেশ্য গোপন করাই যদি তাঁহাদের "ছাত্রভাণ্ডার" স্থাপন করিবার প্রকৃত মতলব হইয়া থাকে, তবে তাঁহারা ইহাকে লিমিটেড কোম্পানী রূপে প্রতিষ্ঠা করিলেন কেন? তাঁহারা কি সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি সাধারণ যৌথ কারবার খুলিতে পারিতেন না? কোন লিমিটেড কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিলেই তাহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও পরিদর্শনের জন্য পরিচালকগণ (Directors) থাকিবেন। তাহার সমস্ত হিসাব পরিদর্শন ও পরীক্ষা করা

চলিবে। কিন্তু একটি সাধারণ দোকান খুলিলে সে-সব হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

যাহা হউক, উহার লভ্যাংশ অসদুদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার জন্যই যে ঐ লিমিটেড কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। তাঁহাদের সে সঙ্কল্প থাকিলে তাঁহারা একটি দোকান খুলিতে পারিতেন। ঐ লিমিটেড কোম্পানীর লভ্যাংশ যে-কোন পাপ উদ্দেশ্যে বা ষড়যন্ত্রে ব্যয়িত হইয়াছে তাহারও কিছুমাত্র প্রমাণ নাই।

(মিঃ নর্টন—উহাতে কোন লাভ হয় নাই।)

যদি লাভই না হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের যে কোন পাপ উদ্দেশ্য ছিল, তাহাও বলা যায় না। সমস্ত বিষয়টি-ই সন্দেহের উপর প্রতিষ্ঠিত। অরবিন্দের ঐরূপ কোন অভিপ্রায় ছিল ইহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও অরবিন্দের যে ইহার সহিত সম্পর্ক ছিল তাহার প্রমাণ কি? তিনি সাক্ষ্যরূপে স্বাক্ষর করিয়াছেন মাত্র। এই বিষয়ে যে প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে সন্দেহের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ পাওয়া যায় না। সাক্ষী পবিত্রচন্দ্র দত্ত বলিয়াছেন, "আমি সুবোধ মল্লিকের কাছে গিয়া তাঁহাকে এবং অরবিন্দকে স্বাক্ষ্যরূপে নাম স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছিলাম, কারণ তাঁহারা বড় লোক।" 'ছাত্রভাণ্ডার'-এর সঙ্গে অরবিন্দের যোগ আছে, ইহা এই স্বাক্ষীর নিকট হইতে বাহির করিবার জন্য মিঃ নর্টন চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাক্ষী বলিয়াছেন, "তাঁহারা বড়লোক বলিয়া আমরা তাঁহাদের কাছে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। সুবোধ মল্লিক মহাশয় বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষালয়ে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। কলিকাতায় তাঁহাকে সকলে খুব বড়লোক বলিয়া জানে।" পবিত্র দত্ত আরো বলিয়াছেন, "অরবিন্দ ঐ সময়ে ১২ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে

থাকিতেন। আমি সুবোধ মল্লিক মহাশয়ের কাছে যাই। তিনি অরবিন্দের দিকে চাহিয়া বলেন, তুমি বরং উঁহার সাক্ষ্য লও।" অরবিন্দের সঙ্গে 'বন্দেমাতরম্'-এর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়া বন্ধুবর বলিয়াছেন, "তিনি সম্পাদক ছিলেন কিনা, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমি বলিতেছি, তাঁহার অস্তিত্বই ঐ পত্রিকার অস্তিত্ব।"........সাক্ষী সুকুমার সেন (জাতীয় বিত্মালয়ের অধ্যাপক) বলিয়াছেন, "অরবিন্দ কোথাও বলপ্রয়োগের (violence) সমর্থন করেন নাই, করিলে আমার স্মরণ থাকিত।"......

আমি দেখিতে পাইতেছি, পুরাতন 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সহিত অরবিন্দ সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 'বন্দেমাতরম' কোম্পানীর কয়েকটি সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার কর্ম্মকর্ত্তা (manager) ছিলেন না। কিছুদিন 'বন্দেমাতরম্' কোম্পানীর কর্ম্ম-পরিচালক (Managing Director) ছিলেন।

আর একটি সাক্ষ্য হইতে বুঝা যায়, অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্'-এর সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদক ছিলেন না। সংবাদ প্রকাশ, কোন-কিছু উদ্ধৃত করণ ইত্যাদির সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্কই ছিল না। এই সম্পর্কে মাননীয় বিচারপতি মহাশয়কে বলিয়া রাখিতে পারি যে, 'যুগান্তর'-এর একটি লেখার ইংরাজী অনুবাদ 'বন্দেমাতরম্'-এ প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া উঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হয়।

(বিচারক—সাক্ষী সুকুমার সেন কি বলেন নাই যে, কে সম্পাদক ছিলেন ?)

সাক্ষী বলিয়াছেন, বিপিনচন্দ্র পাল অরবিন্দ ঘোষের সহিত এক-যোগে সম্পাদকের কাজ করিতে অস্বীকার করেন। তিনি প্রধান

সম্পাদক রূপে পত্রিকার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব চাহেন। এই বিষয় লইয়া মত-ভেদ হয়। অরবিন্দকে সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিতে বলা হয়, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইতে অসম্মত হন; কারণ তাহা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ঐ-সময়ে তিনি জাতীয় শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। পত্রিকার এক সংখ্যায় মাত্র তাঁহার নাম সম্পাদকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু পরের সংখ্যা হইতেই তাঁহার নাম তুলিয়া দেওয়া হয়।

(বিচারক—সম্পাদক বলিয়া তাঁহাকে কয়েকখানি অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়।)

তাহার কারণ, লোকের ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, তিনিই সম্পাদক। 'বান্দেমাতরম'-এ প্রকাশিত কোন রচনার জন্য তিনি দায়ী ছিলেন না। 'সম্পাদক' নামের মধ্যে কোন যাদু নাই।

বন্ধুবর বলিয়াছেন, অরবিন্দ সম্পাদক হউন কি না হউন তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু তিনিই ঐ পত্রিকার প্রাণ এবং ঐ পত্রিকা ষড়যন্ত্র হইতে উদ্ভূত। ভাল, এই পত্রিকাখানি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, ইহাতে ভয়ঙ্কর কিছু আছে কি না—বোমা, ষড়যন্ত্র বা সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের কোন আভাস ইহাতে পাওয়া যায় কি না। মাননীয় বিচারপতি মহাশয় দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, ইহাতে সে-সব কিছু ত নাই-ই, বরং আমি যে স্বাধীনতার আদর্শের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেই আদর্শের ও তাহা লাভের পন্থারূপে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথাই ইহাতে রহিয়াছে। রচনাগুলিতে জাতীয় শিক্ষা, 'স্বদেশী' ও বিদেশী বর্জ্জনের উপরেই—সর্ব্বাপেক্ষা জোর দেওয়া হইয়াছে। পত্রিকাখানির এইগুলিই বিশেষ আলোচ্য বিষয়। চতুর্থ আলোচ্য বিষয়টি ছিল সাধারণ ভাবে স্বাধীনতার কথা। সেই স্বাধীনতা লাভ করিবার

জন্য আমার পূর্ব্ব উল্লিখিত প্রণালীই তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত প্রচার করিয়াছেন। আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহারা গুপ্তসমিতি গঠন ত সমর্থন করেন-ই নাই, বরং ঐরূপ কোন ঘটনা ঘটিলেই তীব্র ভাষায় গুপ্ত সমিতির নিন্দা করিয়াছেন। আমি মুহূর্ত্তের জন্যও বলিতে চাহি না যে, 'বন্দেমাতরম'-এর আদর্শ 'পূর্ণ, স্বাধীনতা' ছিল না। ইহাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় (Executive Council) একটি দেশীয় সভ্য বা বড়লাটের সভায় অতিরিক্ত দেশীয় সভ্য পাঠাইয়া এই দেশের শাসনপদ্ধতির উন্নতি সাধনের আদর্শের তাহারা সর্ব্বদা প্রতিবাদই করিতেন। তাঁহারা বারম্বার বলিয়াছেন যে, তাঁহারা শুধু সংস্কার (reform) চাহেন না, তাঁহারা নূতন করিয়া গঠন বা 'সৃজন' (forming) চাহেন। অল্প-স্বল্প করিয়া শাসনপদ্ধতির উন্নতিসাধন দ্বারা, অর্থাৎ এইখানে একটু সুবিধা ও ঐখানে আর একটু সুবিধা করিয়া দিলে, জাতীয় আদর্শের পরিপূরণ হইবে না। লর্ড মর্লির শাসন-পদ্ধতির নিন্দাসূচক যে প্রবন্ধগুলি সরকার পক্ষ হইতে আপনাদিগকে পড়িয়া শুনান হইয়াছে, সেগুলিতে ঐ আদর্শের কথাই বলা হইয়াছে। এই পত্রিকার উহাই সরল সহজ মতামত। যদি ঐ প্রকার মতামত ব্যক্ত করিলেই সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়, তাহা হইলে অরবিন্দকে নিশ্চয়ই দোষী বলিতে হইবে। আমার বক্তব্য এই যে, স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারে তাঁহাদের পক্ষে কোন বাধা নাই এবং 'বন্দেমাতরম'-এর ন্যায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, বিদেশী বর্জ্জন, জাতীয় শিক্ষা ও স্বরাজের উপায় নির্দ্দেশ করিবারও তাঁহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। বিচারপতি মহাশয় দেখিতে পাইবেন যে, কেহ আক্রমণ করিলে কেবল সেই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যই শারীরিক শক্তি প্রয়োগের কথা বলা হইয়াছে।

কোনরূপ ষড়যন্ত্র হইতে যে 'বন্দেমাতরম'-এর উদ্ভব হয় নাই তাহা আমি ইহার কয়েকটি লেখা পড়িয়া শুনাইলেই বুঝিতে পারিবেন। ১৯০৬ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের কাগজের That Sinful Desire (ঐ পাপ ইচ্ছা) নামক লেখাটির কথা আমি উল্লেখ করিতেছি।....এই রচনাটিতে কংগ্রেসের গঠননীতি-মূলক অসুবিধাগুলির (constitutional difficulties) আলোচনা করা হইয়াছে। প্রবন্ধগুলিতে দুরভিসন্ধি-মূলক কিছুই নাই—যদি না আমার বিজ্ঞ বন্ধু বলিতে চাহেন যে, ইহাদের কোন গুহ্য অর্থ আপনারা অবশ্য বাহির করিয়া লইবেন।

* * * *

এখন 'জাতীয় শিক্ষালয়' সম্বন্ধে আমার একটি কথা বলিবার আছে। এস্থলেও বন্ধুবরের যুক্তি আমি ভালরূপ বুঝিতে পারিতেছি না। 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, ইহা তিনি বলেন না। তবে তিনি বোধ হয় বলিতে চাহেন যে, অরবিন্দ তাঁহার অসদভিপ্রায়কে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ঐ শিক্ষা-পরিষদটিকে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার সহিত জাতীয় শিক্ষালয়ের যোগ ছিল বলিয়াই যেন বিচারপতি মহাশয় কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত না হন। যদি কোনরূপ সিদ্ধান্তই করিতে হয়, তাহা হইলে ব্যাপারটিকে আরও তলাইয়া দেখিতে হইবে —'জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ' কল্যাণকর নহে কেবলমাত্র ইহা প্রমাণ করিলেই চলিবে না, অধিকন্তু প্রমাণ করিতে হইবে যে, এই অনুষ্ঠানটি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইহা প্রমাণিত না হইলে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বলিয়াই অরবিন্দের বিরুদ্ধে কিছু অনুমান করা যাইতে পারে না। প্রদত্ত সাক্ষ্য হইতে আপনারা বুঝিতে পারিবেন, শুধু জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের আরম্ভ হইতেই যে অরবিন্দ ইহার সহিত

সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহা নহে, তিনি উহা পরিচালনার জন্যই বাংলায় আগমন করেন। সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জির সাক্ষ্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ইহা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই অরবিন্দের ইহার সহিত সংশ্রব ছিল এবং সওয়াল জবাবের (argument) অধিকাংশ স্থল হইতেই বুঝিতে পারা যায়, জাতীয় শিক্ষা-পরিষদকে ষড়যন্ত্রের অস্ত্রস্বরূপে ব্যবহার করিবার ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ গঠনের সময় কাহারা ইহার মধ্যে ছিলেন? ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, স্যর গুরুদাস ব্যানার্জ্জী এবং মিঃ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ—শেষোক্ত দুইজনের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক আছে ইহা কেহই বলিতে পারিবেন না। উহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়, অরবিন্দের ইহার উপর কোন কর্ত্তৃত্ব ছিল না—আর যদিই বা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলেও তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যের উপায় স্বরূপে ইহাকে ব্যবহার করিবার অভিপ্রায় অরবিন্দের ছিল না। বাঙ্গালীরা জাতীয় শিক্ষা-পরিষদকে রাজনীতি-সম্পর্ক-মুক্ত রাখিতে চাহিয়াছিলেন। উল্লিখিত নামগুলি হইতেই ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়। পরিষদের অনুষ্ঠান-পত্র (Prospectus) হইতেই জানা যায় যে, এই প্রতিষ্ঠানটি দেশে শিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্যই স্থাপিত হইয়াছিল এবং রাজনীতির সহিত ইহার কোনরূপ সম্পর্ক না থাকে ইহাই ছিল সকলের অভিপ্রেত। ঐ-কাজের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়াই অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯০৬ সালের আগষ্ট মাসে যখন তিনি কলিকাতায় আসেন, তখনও বরোদার চাকুরী তাঁহার বহাল ছিল। জাতীয় শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ পদ প্রাপ্তির পরে তিনি চাকুরী ছাড়িয়া দেন।..........এমন কি পাঠ্য বিষয় নির্ব্বাচন সম্বন্ধেও অরবিন্দের কার্য্যকরী ক্ষমতা কিছু ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ নাই।

অরবিন্দের বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আনীত হইয়াছে তিনি সেগুলির জন্য বাস্তবিকই অপরাধী কিনা এই সমস্যা সমাধানের পক্ষে আলোচ্য বিষয়টির বিশেষ কোন মূল্য নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলেও ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ১৯০৫ সালের ১৩ই আগষ্টের পত্রখানিতে যে মূলনীতির (principles) কথা বলা হইয়াছে, ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অরবিন্দ তাঁহার সকল কাজে সেই নীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন।

এখন ১৯০৬ সালের অক্টোবর মাস হইতে ১৯০৭ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত সময়ের আলোচনা করিব। এই সময়ে অরবিন্দ বিশেষ কোন কাজই করেন নাই, কারণ প্রায় সর্ব্বদাই তিনি অসুস্থ ছিলেন। আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, ১৯০৬ সালের ১১ই ডিসেম্বর হইতে ১৪ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এবং ১৯০৭ সালের ২৭-এ জানুয়ারী হইতে এপ্রিলের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তিনি দেওঘরে ছিলেন। আপনারা সুকুমার সেনের সাক্ষ্য হইতে জানিতে পারিয়াছেন, যে দিন রাত্রে অরবিন্দ দেওঘর যাত্রা করেন, সেইদিন রাত্রেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি 'বন্দেমাতরম'-এর সম্পাদক হইতে সম্মত আছেন কি না—যদিও সেই দিনের পত্রিকায় সম্পাদক রূপে তাঁহার নাম মুদ্রিত হইয়াছিল এবং তিনি সম্পাদক হইতে অস্বীকার করিলে পরের দিনই তাঁহার নাম কাগজ হইতে তুলিয়া দেওয়া হয়।............এই সম্পর্কে আমরা দেখিতে পাই যে, অরবিন্দ অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থতার জন্য 'জাতীয় শিক্ষালয়' হইতে তাঁহাকে কয়েকবার ছুটিও লইতে হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রায় সমস্ত সময়টাই তিনি অসুস্থ ছিলেন।...সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে, অরবিন্দের অবকাশ গ্রহণের কথা সত্য।

এই সম্পর্কে আমি আরও বলিতে চাই যে, ঐ সময়ে 'শীল নিবাসে' (Seal's Lodge) কোন কার্য্য হইয়াছে এরূপ কথা বন্ধুবরও বলেন নাই। ১৯০৮ সালের জানুয়ারীর শেষভাগ হইতে এপ্রিলের কিছুদিন পর্য্যন্ত সেখানে কিছু কাজ হয়।

এই সময়ের 'বন্দেমাতরম্' হইতে বন্ধুবর 'স্বরাজ', 'স্বায়ত্তশাসন' ইত্যাদি বিষয়ক কয়েকটি রচনা পাঠ করিয়া বলিয়াছেন, ঐ-সব রচনার মধ্যে জাতি-বিদ্বেষের ভাব রহিয়াছে, উহা সার্ব্বজনীন প্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ নহে এবং উহাতে সাক্ষাৎ আইন অমান্য করাকে (direct violation of the law) সমর্থন করা হইয়াছে। আমিও ঐ প্রবন্ধগুলি বারম্বার পড়িয়াছি এবং বলিতেছি যে, ঐ-সব অভিযোগের কোন ভিত্তিই নাই—

স্বরাজ আনয়নের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ আনা যায় বটে, কিন্তু বন্ধুবর সেরূপ কোন অভিযোগ আনিতে চাহিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমার মনে হয়, বন্ধুবর বলিতে চাহিয়াছেন, স্বরাজলাভের যে উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সে উপায় আইন-সঙ্গত নহে এবং ইহার জন্যই স্বরাজের আদর্শও গর্হিত বা দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে।............

শুধু এই রচনাগুলির জন্য 'বন্দেমাতরম্'-এর বিরুদ্ধে জাতিবিদ্বেষের অভিযোগ আনয়ন করা যায় না। দেশবাসীর প্রতি প্রেম (love for its own people) প্রচার করাই 'বন্দেমাতরম্'-এর বিশেষ উদ্দেশ্য এবং এই ভাবটির মধ্যে অল্প পরিমাণে জাতিবিদ্বেষ থাকা খুবই সম্ভব, কিন্তু আমি বিশেষ করিয়া বলিতে চাই যে, প্রধান বিষয়টি বিদ্বেষ নহে, দেশবাসীর প্রতি প্রেম। এই 'দেশবাসীর প্রতি প্রেমের' কথা বলিতে গিয়া অন্যান্য জাতির (other nations) সম্বন্ধে হয়ত কোন প্রশংসাসূচক কথা বলা

হয় নাই। সমস্ত জিনিষটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বিশেষ কোন জাতির প্রতি আক্রমণ আদৌ ইহার উদ্দেশ্য নহে, ইহার উদ্দেশ্য দেশবাসীকে আত্মনির্ভরশীল হইতে ও নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াইতে বলা—অর্থাৎ নিজেদের মুক্ত করিতে না পারিলে দেশোদ্ধার সম্ভব হইবে না ইহাই প্রচার করা। 'বন্দেমাতরম্' অন্যান্য জাতিকে আক্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, কারণ ইহা এতদ্দেশীয় লোকের বিদেশীয় ও বিরুদ্ধ সভ্যতার মোহে মুগ্ধ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং ইউরোপীয় জাতি-সমূহ এ দেশবাসীর উপরে যে অদ্ভুত মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে, এই প্রবন্ধগুলি দ্বারা তাহা অপসারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতা মন্দ নহে, কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতা ইউরোপীয়দের জন্য, আমাদের জন্য নহে। তাহারা তাহাদের পন্থায় উন্নতি লাভ করুক, তাহারা তাহাদের চিরাগত প্রথা (tradition) অনুযায়ী মহত্তম ও শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করুক। সেইরূপ ভারতীয়দেরও আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে। আপনারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন যে, প্রবন্ধগুলিতে কোথাও ইউরোপীয় সভ্যতাকে মন্দ বলা হয় নাই, কিন্তু আমাদের দেশে ইউরোপীয় সভ্যতার বিস্তার বা ইউরোপীয় রীতিনীতির প্রবর্ত্তন দ্বারা আমাদের জাতির উন্নতি হইতে পারে না। সমস্ত প্রবন্ধগুলির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব এই। ইউরোপীয় সভ্যতাকে ইংলণ্ডজাত বৃক্ষের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; ঐ বৃক্ষ ইংলণ্ডের মৃত্তিকায় বর্দ্ধিত হয় বটে, কিন্তু এ-দেশে আনিয়া রোপণ করিলে উহা সেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, কারণ এস্থানের মৃত্তিকা তাহার বৃদ্ধির পক্ষে উপযোগী নহে। সেইরূপ স্বীয় চিরাচরিত প্রথাকে ভিত্তি করিয়াই জাতি বিশেষকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ঐ প্রবন্ধগুলিতে মনুষ্যজাতির প্রতি বিদ্বেষ বা বিরাগ বলিয়া

কিছু পাওয়া যাইবে না। বন্ধুবর প্রবন্ধগুলিতে যে-সকল আদর্শের অভাব দেখিয়াছেন, সেই সকল আদর্শের কথাই উহাতে বিশেষ ভাবে রহিয়াছে। ইঁহারা মনে করেন যে, সমগ্র মনুষ্যজাতির উপকারে না আসিলে কোন বিশেষ জাতির স্বজাতিপ্রেমের ন্যায়সঙ্গত কারণ কিছু থাকিতে পারে না।

... ...

১৯০৭ সালের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষালয় ও 'বন্দেমাতরম্' লইয়াই ব্যাপৃত ছিলেন। ঐ সময়ের 'বন্দে-মাতরম্'-এর রচনাগুলিতেও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের আদর্শই আলোচিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই ঐ একই কথা বলা হইয়াছে। কংগ্রেস, স্বরাজ প্রভৃতি বিষয় লইয়াই প্রবন্ধগুলি রচিত।

ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অরবিন্দের বিরুদ্ধের সকল প্রমাণগুলিই সন্দেহজনক। অরবিন্দের বিচারপ্রসঙ্গে বিচারপতি মহাশয় যদি অস্বাভাবিক বা দুর্ব্বোধ্য কিছু লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি জানিবেন যে, ঐ দুর্ব্বোধ্য বিষয়গুলির পশ্চাতে কিছু রহস্য আছে। কোন একটি কাজ বারম্বার করা হইয়াছে দেখিলেও বিচারপতি মহাশয় ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন।.........

এখন ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বিচারপতি মহাশয় দেখিতে পাইবেন যে, ১৯০৭ সালের অক্টোবরের মধ্যভাগ হইতে প্রায় ডিসেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত অরবিন্দ অসুস্থ অবস্থায় দেওঘরে ছিলেন। এই বিষয় সম্পর্কে চিঠিপত্র ও অন্যান্য প্রমাণাদির প্রতি আমি বিচারপতি মহাশয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি, কারণ ইহাদের সঙ্গে কেবল এই বিষয়টিরই নয়, অন্যান্য কতকগুলি বিষয়েরও বিশেষ সংশ্রব আছে।

............অরবিন্দ কংগ্রেসকে প্রতিনিধিমূলক করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, যে সম্মিলনকে জাতীয় সম্মিলন নামে অভিহিত করা হয়, তাহা সত্য সত্যই 'জাতীয়' হওয়া উচিত।

(বিচারক—কংগ্রেস ত উঠিয়া গিয়াছে ?)

চরমপন্থীদের মতে কংগ্রেস উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু নরমপন্থীদের মতে ইহা এখনও চলিতেছে।......

মিঃ কে, বি, দত্তের সাক্ষ্য হইতেই বিচারপতি মহাশয় বুঝিতে পারিবেন যে, 'কন্‌ফারেন্স'-এর সময় বিলাতী বর্জ্জন নীতি ত্যাগ করা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিপ্রেত ছিল না। ইহার কয়েকদিন পরে 'স্বদেশী' কথাটির দ্বারাই সকল বিষয় বুঝাইতেছে এই মর্ম্মে তাঁহারা এক ইস্তাহার জারি করেন। চরমপন্থীরা বলেন, দেশবাসী বিলাতী বর্জ্জন সম্বন্ধে খুব উৎসাহী, তাহাদিগের চক্ষে ধূলি দিবার জন্যই এই ইস্তাহার জারি করা হয়।

বহুসংখ্যক চরমপন্থী প্রতিনিধিকে কংগ্রেসে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিবার জন্য মিঃ তিলক অরবিন্দকে একখানি পত্র লিখেন। তিলক জাতীয় দলের (Nationalists) জন্য পৃথক্ 'কন্‌ফারেন্স' বা সম্মিলনী করিতে চাহেন। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইলেই একটি পৃথক্ সম্মিলনী করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। কংগ্রেস ভঙ্গ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি নির্ব্বাচন করা না করার সমস্যা তাঁহারা 'ভোট' দ্বারা মীমাংসা করিতে চাহিলেন। চরমপন্থীরা তাঁহাদের নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র প্রকারের একটি সমিতি (a separate sort of party organisation) স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। ইংলণ্ডেও প্রত্যেক দলের নিজস্ব একটি সমিতি আছে। উদারপন্থী

(Liberals), সংরক্ষণনীতি-অবলম্বী (Conservatives) হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজতন্ত্রবাদী (Socialists) পর্য্যন্ত সকল দলেরই স্বতন্ত্র ও নিজস্ব সমিতি আছে। প্রতিনিধিবর্গের মত কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ইহাই ছিল তাঁহাদের কাম্য। জাতীয়-সম্মিলনীর (Nationalist Conference) অধিবেশন হয় এবং সেখানে অনেকগুলি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহারা কংগ্রেস ভঙ্গ করিবার জন্য মিলিত হন নাই। তাঁহারা বলেন নাই যে, "তোমরা আমাদের মতামত গ্রাহ্য না করিলে আমরা তোমাদের মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।" বোমার কথা তাঁহাদের কল্পনারও বহির্ভূত ছিল। বন্ধুবর বলিয়াছেন, তাঁহাদের মনে মনে বোমার কথাই ছিল, কিন্তু আমি তেমন কথা বলি না।

(বিচারপতি—ইহাকে কংগ্রেসে তাঁহাদের মত একরূপ জোর করিয়া চালানোই বলা যায়।

মিঃ নর্টন—নিশ্চয়ই।)

ব্যাপারটি এইরূপ ঘটিয়াছিল—জাতীয়দলের প্রতিনিধিগণ ডাঃ রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি করিতে চাহেন নাই, তাঁহারা লালা লাজপত রায়কে অথবা তিনি অস্বীকার করিলে, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জিকে সভাপতি করিতে চাহিয়াছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। নরমপন্থীরা ঔপনিবেশিক (colonial) স্বরাজ চাহেন। আর চরম-পন্থীরা চাহেন স্বাধীনতামূলক স্বরাজ।

[মিঃ নর্টন—নরমপন্থীরা উপনিবেশগুলির শাসনপদ্ধতির ন্যায় শাসন-পদ্ধতি চাহেন।

মিঃ দাশ—দুই-এর মধ্যে প্রভেদ কি? উপনিবেশগুলির উপরে ইংলণ্ডের কি কর্তৃত্ব আছে?

বিচারপতি—ইহা চালবাজী মাত্র। (It is a matter of policy)]

আদর্শ লইয়া কোনরূপ বিতর্ক উপস্থিত হয় নাই। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় মহাসভার (Parliament) পক্ষে তাহার মতামত জোর করিয়া চালানো সম্ভব নয়। চরমপন্থীরা নিজেদের আদর্শকে যেরূপে প্রচার করেন তাহাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত (logical)। 'বন্দেমাতরম'-এ এই বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। নরম ও চরমপন্থী উভয়েরই লক্ষ্য এক, কিন্তু চরমপন্থীদের ন্যায় সাহস করিয়া স্পষ্ট কথা বলিবার ক্ষমতা নরমপন্থীদের নাই।

... ...

কংগ্রেসের গঠনমূলক নিয়মাবলীর খসড়া সম্বন্ধে আলোচনা বিচারপতি মহাশয় ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছেন। ঐ বিষয়টিও চরম ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিবাদের অপর একটি কারণ।.........আমার মনে হয়, এই খসড়াটি কংগ্রেসের নিয়মাবলী গঠনের উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত হইয়াছিল। জাতীয় ধনভাণ্ডার (National Fund), সালিশ-আদালত (Arbitration Court), প্রাথমিক শিক্ষা, স্বরাজ ও বিলাতী বর্জ্জন সম্বন্ধে নিয়মাবলী রচিত হইয়াছিল।* উহার সম্বন্ধে কংগ্রেসে আলোচনা করা অথবা কংগ্রেস পরিচালনার জন্য তৈরী ঐ নিয়মাবলীর খসড়া দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করা তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল। ইহার মধ্যে সালিশী বিচারের পদ্ধতি স্থাপনই সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ—অবশ্য আমাদের দৃষ্টিতে। কিন্তু এই খসড়ার মধ্যে দুরভিসন্ধিমূলক কিছু নাই—বোমা, ষড়যন্ত্র বা ঐরূপ খারাপ অন্য কিছু সংক্রান্ত কোন কথাও নাই।

ঐ সময়ে আরও কতকগুলি পত্র বাহির হয়। আমি সেগুলি পড়িব না। সেগুলি হইতে 'বন্দেমাতরম'-এর সঙ্গে অরবিন্দের কি সম্পর্ক তাহা বুঝিতে পারা যায়; ইহা স্বীকার করা হইতেছে। অরবিন্দের দেওঘরে অবস্থানের কথা বলিবার সময় আমি উহার একখানি পত্রের উল্লেখ করিয়াছি। ঐ পত্রে পত্রলেখক 'বন্দেমাতরম'-এর উন্নতিকল্পে কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। পত্রখানি বোম্বাই-এর এক ভদ্র-লোকের লিখিত। তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'বন্দেমাতরম'-এর উপরে অরবিন্দের কিছু কর্তৃত্ব আছে, সেইজন্যই তিনি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া-ছিলেন। ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অরবিন্দের যে প্রকারেরই হউক কিছু কর্তৃত্ব ইহার উপরে ছিল, আর সে-কথা আমি এখানে এবং বিচারের সময় অন্যত্র বরাবরই স্বীকার করিয়াছি।

'বন্দেমাতরম'-এর জন্য অরবিন্দ যেটুকু কাজ করিতেন তাহা খাতিরেই করিতেন। 'বন্দেমাতরম'-এ প্রকাশিত সকল রচনার জন্যই তিনি দায়ী থাকিবেন, এমন ভার বা কর্তৃত্ব তিনি লইতে ইচ্ছা করেন নাই, উহার তত্ত্বাবধান করার মত তাঁহার সময় বা স্বাস্থ্যও ছিল না। সেই জন্যই তিনি সম্পাদক হইতে অস্বীকার করেন। কোন সময়েই তিনি সম্পাদক ছিলেন না।···তিনিই যে দায়ী তাহার কোন প্রমাণও নাই।

··· ··· ··· ···

'বন্দেমাতরম'-এর একটি প্রবন্ধ হইতে আমি দেখাইব যে, তাহার মতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, স্বদেশী, বিলাতি বর্জন, জাতীয় শিক্ষা ও সালিশ-আদালত ইত্যাদির দ্বারাই স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। গ্ল্যাডস্টোনের একটি প্রসিদ্ধ বক্তৃতায় আছে—"স্বায়ত্তশাসনের জন্য নিজেদের শিক্ষিত করিতে হইবে। শাসন-কার্য্যের সাধ্যানুরূপ ভার গ্রহণ করিতে হইবে।"

'বন্দেমাতরম' জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশী প্রভৃতি পন্থাগুলি নির্দেশ করিয়াছে, তাহার মতে কেবলমাত্র এই উপায়গুলি অবলম্বন করিয়াই স্বায়ত্তশাসন লাভ করিতে পারা যাইবে।

স্বায়ত্তশাসন লাভ করিতে হইলে স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য হইতে হইবে—ইউরোপীয় রাজনীতিবিদ্‌দের এই মতের উপরেই উক্ত মত প্রতিষ্ঠিত (based) হইয়াছে। 'বন্দেমাতরম্' পুনরায় এই মতটি বিশ্লেষণ (analysis) করিয়া খাঁটি বৈদান্তিক মতানুযায়ী করিয়া লইয়াছেন। ইংলণ্ডের সকল দার্শনিকই গণতন্ত্রের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। হব্‌সের সময় হইতে স্পেন্‌সারের সময় পর্য্যন্ত—অর্থাৎ ইংলণ্ডের ইতিহাসের ফরাসী বিপ্লবের যুগ হইতে বরাবর সকলেই বলিয়াছেন, সাধারণের মৌন সম্মতির (tacit consent) উপরেই সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। সরকার যার-পর-নাই যথেচ্ছাচারী অথবা প্রতিনিধিমূলক যাহাই হউক না কেন, তাহার অস্তিত্বই প্রমাণ করিয়া দেয় যে, সাধারণের ইহাতে সম্মতি আছে। হব্‌স্ বলিয়াছেন, এমন এক সময় ছিল, যখন রাজা ও জনসাধারণ একত্র মিলিত হইতেন। সাধারণের সম্মতি গ্রহণের জন্যই তাঁহারা মিলিত হইতেন।

লক্ তাঁহার এই বিষয়ের মতামতের জন্য রুশোর নিকট ঋণী। স্পেন্‌সারের 'ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্রে' (Man vs. State) এই মতই প্রচারিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে পরস্পরের চুক্তি বা সম্মতির উপরেই শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধ স্থাপিত। ইতিহাসের দিক্ হইতে ইহা সত্য নাও হইতে পারে, কিন্তু যুক্তির দিক্ হইতে ইহা সত্য। জনগণকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসন করা যায় না। সরকারের অস্তিত্ব সকল সময়ে ইহাই বুঝাইয়া দেয় যে, জনসাধারণ ইহাকে সমর্থন করে।

অরবিন্দও ঐ একই মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। নূতন ভাবে তিনি ইহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহা তাঁহার দর্শনের একটি নূতন তথ্য। সরকার জনসাধারণের মৌন সম্মতির উপরে প্রতিষ্ঠিত ও জনগণের বাণীই ভগবানের বাণী—এই উভয় মতেরই এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে। জাতি ও ব্যক্তি উভয় ক্ষেত্রেই অরবিন্দ একই নীতি (principle) মানিয়া চলেন। সমাজ ও ব্যক্তির উন্নতির মধ্যে তিনি ভগবানেরই প্রকাশ উপলব্ধি করেন। প্রকৃতির বা ঈশ্বরের বিধানানুযায়ী ক্রমবিকাশ বা বিবৃদ্ধিকে তিনি বেদান্তের আলোকেই দর্শন করেন। 'জনগণের বাণীই ভগবানের বাণী', কেন না, জনগণে ভগবানেরই প্রকাশ। কঠোর আত্মসংযম ব্যতীত কেহ মুক্তিলাভ করিতে পারে না। আত্মসংযম বিনা মুক্তিলাভের আশা করা বাতুলতা মাত্র।

অরবিন্দের ন্যায় দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই মতবাদ (doctrine) অনুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে ফল হইবে এই যে, দেশবাসী স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসন চাহিবে।...অরবিন্দ ইচ্ছা করিয়াই স্বরাজের স্বরূপ কখনও বর্ণনা করেন নাই। অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা, 'স্বদেশী', বিলাতী বর্জ্জন ও সালিশ-আদালতের সমর্থন করিয়াছেন। অপর দিকে 'যুগান্তর', 'সূচনা' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, স্বাধীনতা ভিন্ন দেশের কোন উন্নতি অসম্ভব। 'স্বদেশী'র নাম করিলে 'যুগান্তর' বিদ্রূপ করেন, জাতীয় শিক্ষা ও সালিশ-আদালতের কথা তুলিলে তাহাকে 'ছেলেখেলা' বলেন। 'যুগান্তর'-এর মতে পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত দেশের কোনরূপ উন্নতি সম্ভবপর নয়। এইখানেই 'বন্দেমাতরম্' ও 'যুগান্তর'-এর মূলনীতির আসল বা মূল পার্থক্য।

... ...

ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া অরবিন্দ তাঁহার Morality

of boycott (বিলাতী বর্জ্জন উচিত কি অনুচিত) নামক রচনাটি প্রকাশ করেন নাই। অপ্রকাশিত রচনার জন্য একজন লোককে দোষী সাব্যস্ত করা যায় কি? এই রচনাগুলি হইতে অরবিন্দের চিন্তাধারার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় কি না, তাহা বিচারপতি মহাশয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমার মনে হয়, তাহা পাওয়া যায় না; কারণ ঐ রচনাবলীতে ব্যবহৃত ভাষার দ্বারা তাঁহার আদর্শ সুপরিস্ফুট হয় নাই। লোকে ভুল বুঝিতে পারে, এই ভয়ে অরবিন্দ উহা প্রকাশ করেন নাই। ইহা গোপনে লোকের মধ্যে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে রচিত গুহ্য দলিল বিশেষ এইরূপ প্রমাণ না করিতে পারিলে, ইহা যে অরবিন্দের চিন্তাধারার পরিচায়ক এ সিদ্ধান্তও করা যাইতে পারে না। আশা করি বিচারপতি মহাশয় উদার ভাবেই ইহার ব্যাখ্যা করিবেন। রচনাগুলি কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। অরবিন্দ সহজেই ইহাদিগকে প্রকাশ করিতে পারিতেন। লোকের ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে আশঙ্কায়ই তিনি রচনাগুলি প্রকাশ করেন নাই—ব্যাপারটিকে এইরূপ উদার ভাবে অনায়াসেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিচারপতি মহাশয় বিষয়টিকে ঐরূপ ভাবে গ্রহণ করিবেন ইহাই আমার অনুরোধ। বন্ধুবর যেরূপ ব্যাখ্যা করিতে চাহেন ইহার অর্থ আদৌ সেরূপ নয়।

এখন আমি 'What is extremism?' (চরমপন্থা কি?) নামক অপ্রকাশিত প্রবন্ধটি পড়িয়া আপনাদিগকে শুনাইতেছি।···

[বিচারপতি—প্রবন্ধটিতে একস্থানে বলা হইয়াছে—'আইন মানুষের জন্য তৈরী হইয়াছে, মানুষ আইনের জন্য তৈরী হয় নাই' ('the law was made for man and not man for the law')—তাহা হইলে প্রত্যেক মানুষেরই আইন সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিবার অধিকার আছে কি?

মিঃ দাশ—নিশ্চয়ই আছে। সকল দিক্ বিবেচনা করিলে বলিতে হয় যে, প্রত্যেকেরই তাহার বিবেক দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত।

মিঃ নর্টন—সেরূপ পরিচালিত হইলে জনসমাজ টিকিবে কিরূপে?

মিঃ দাশ—অন্যান্য দেশেও কি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive resistance) সম্বন্ধে ঠিক এইরূপ মতই প্রচারিত হয় নাই? সেখানকার লোকেরাও কি অনেক সময় আইন অমান্য করিয়া তাহার জন্য দণ্ড গ্রহণ করে নাই?

মিঃ নর্টন—আইন অন্যায় বলিয়া তাহারা ঐরূপ করে নাই।

মিঃ দাশ—কিন্তু অরবিন্দ তাহাই মনে করেন।......]

অরবিন্দের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, আপনারা এখানে যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন তাহা স্বাভাবিক ভাবে এই জাতির তরফ হইতে আপনাদিগকে প্রদত্ত হয় নাই। অন্যান্য দেশের ন্যায় এ-দেশের সরকার দেশের অধিবাসীদের ভিতর হইতে উদ্ভূত হয় নাই।

অরবিন্দ ইহা বারম্বার বলিতে কোনদিনই কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। এ-দেশের সরকার স্বেচ্ছাচারী বলিয়া, বা গণতন্ত্রমূলক নয় বলিয়া, অথবা ইহার কতকগুলি কাজের বিরুদ্ধে সমালোচনা হয় বলিয়াই যে আমরা ইহার বিরোধী তাহা নহে। দার্শনিক যুক্তির উপরেই এই বিরোধিতার ভিত্তি; এই সরকার দেশজ নহে—ইহা দেশবাসীর নিজস্ব নহে বলিয়াই আমরা ইহার বিরোধী।

অরবিন্দের যুক্তির মূলে রহিয়াছে 'উপযোগিতা' বা 'প্রয়োজনীয়তা' 'utility')। প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের সকল আইনের ভিত্তিই হইতেছে উপযোগিতা বা প্রয়োজনীয়তা—এমন-কিছু যাহা জাতির ক্রমোন্নতি ও বিবৃদ্ধির সহায়ক। ইহাই সরকার বলেন। সাধারণের মঙ্গল বা সুবিধার

জন্যই সরকার আইন প্রচলন করেন এবং জাতির (nation) উন্নতি হইতে সাধারণের (people) স্বার্থকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখাও সম্ভব নয়।

... ...

তথাপি অরবিন্দের মতে হিংসার পথ খারাপ, শান্তির পথই ভাল।............জাতীয় স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারকে দণ্ডবিধি আইনের কোন ধারায় বে-আইনী বলা হয় নাই; তাহা বলা হইলেও অরবিন্দ বলিতেন—"তথাপি আমি ইহা প্রচার করিবই। ইহা না করিয়া থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ইহা আমার অন্তরের জিনিষ এবং ইহা প্রচারের জন্য আমি আমার নিজের কাছে ও ভগবানের নিকটে দায়ী।"

কয়েকটি সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গে একস্থানে অরবিন্দ বলিয়াছেন, "ফল হইবে অরাজকতা বা বিপ্লব।" ("result will be anarchy") মিঃ নর্টন ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াও ইহার অর্থ করিয়াছেন যে, অরবিন্দ "বিপ্লবীদের অত্যাচার"-এর ("anarchists' outrages") কথা বলিয়াছেন। কোন ইংরাজ গ্রন্থকার 'anarchy' (বিপ্লব)কে 'anarchists' outrages' (বিপ্লবীদের অত্যাচার) অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ইহা কি মিঃ নর্টন দেখাইতে পারেন? "Anarchy"র অর্থ অরাজকতা বা বিশৃঙ্খলা—এবং অরবিন্দ একপ্রকার সামাজিক বিশৃঙ্খলার কথাই বলিয়াছেন।

অরবিন্দ স্থানে স্থানে যে-সকল রূপক বা অলঙ্কার (metaphor) ব্যবহার করিয়াছেন মিঃ নর্টন সেগুলির কথায় কথায় (literally) অর্থ করিয়াছেন। অরবিন্দ দেশবাসীকে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে বলিয়াছেন—তাহার অর্থ এই যে, তিনি তাহাদের দেশের জন্য

কষ্ট সহ্য করিতে বলিতেছেন। "আমাদের রক্তে দেশের মাটিকে উর্ব্বর করিতে হইবে"—কথায় কথায় এই কথাটির যাহা অর্থ হয় কাজে তাহা করা কি কখনও সম্ভব? ইহা একটি রূপকমাত্র। তিনি দেশবাসীকে চরম দুঃখ সহ্য করিতে উদ্দীপিত করিয়াছেন। যদি দেশের সকল লোক কর দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে সেই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ফল কি হইবে? ইহার আলোচনা সুখকর হইবে না, কিন্তু সহজেই অনুমান করা যায় যে, গোলাগুলি বর্ষিত হইবে এবং তাহার ফলে দেশ রক্তে রঞ্জিত হইবে।

অরবিন্দ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাকে কার্য্যে পরিণত করা কখনও সম্ভব নহে। নিছক তর্কের খাতিরে একটি ভুল যুক্তির উপরে নির্ভর করিয়া তিনি ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে আদর্শ ও তাহা লাভের পন্থার উপরেই তিনি বিশেষ জোর দিয়াছেন। আদর্শটি ফলপ্রসূ হইবে কি না এবং দেশের চিরাগত প্রথার সহিত তাহার ঐক্য হইবে কিনা, ইহাই তাঁহার আলোচ্য বিষয়। কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত না হইলে কোন পরাধীন জাতিই নিজের অবস্থার উন্নতি করিতে পারে না। রক্ত (blood), অন্ধকার (darkness) ও মৃত্যু (death) এই কথাগুলি রূপকচ্ছলে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইলেও তাহা ভাল, কারণ ইহা তাহাদের ঈপ্সিত উন্নতি লাভে সহায়তা করিবে। ইহা হইতে মিঃ নর্টন অনর্থক বোমা, গোলাগুলি বা ঐরূপ অন্য কিছুর কল্পনা করিয়াছেন।

••• ••• ••• •••

অরবিন্দের অপ্রকাশিত রচনাবলীর মূল ভাবের সহিত তাঁহার অন্য রচনাগুলির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। এখানকার একটি কথা, অন্য স্থানের

আর একটি কথা, এইরূপ ভাবে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলে তাঁহার মনোগত ভাব ঠিক বুঝা যাইবে না। বিচারপতি মহাশয়কে ঐ রচনাটির সঙ্গে অন্য রচনাগুলিও পড়িয়া দেখিতে হইবে।

অপর একটি রচনায় কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "Who would free themselves must themselves strike the blow" (যাহারা মুক্তিকামী তাহাদের নিজেদেরই পরাধীনতার মূলে আঘাত করিতে হইবে) পঙ্‌ক্তিটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বন্ধুবর ইহাতেও যেন বোমার আভাস পাইয়াছেন। বিচারপতি মহাশয় সমগ্র প্রবন্ধটি পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে, কংগ্রেসে রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় প্রদত্ত বক্তৃতার প্রশংসা প্রসঙ্গেই উহা লিখিত হইয়াছে। জাতিকে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়াই গড়িয়া উঠিতে হয়—রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের এই উক্তিকে সমর্থন করিতে যাইয়াই অরবিন্দ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার ঐ পদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এই বিচারে প্রকাশিত ঘটনাবলী হইতে বিচারপতি বুঝিতে পারিবেন যে, "Sweets letter" (মিষ্টান্নবিষয়ক পত্রখানি) বারীন্দ্রকুমার ঘোষের স্বহস্ত লিখিত নহে এবং ইহা অরবিন্দের নিকটও প্রেরিত হয় নাই। পত্রখানি কি প্রমাণ করে? সুরাটে এক ভ্রাতা যেন অন্য ভ্রাতাকে এই পত্রখানি লিখিয়াছেন। ইহা জাল না হইলে বুঝিতে হইবে যে, উভয় ভ্রাতাই তখন সুরাটে ছিলেন। তাঁহাদিগকে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া ধরিয়া লইলেও এক ভাই অপর ভাইকে এই ভাবে পত্র লিখিতে পারেন, ইহা একেবারেই অসম্ভব। সেখানে তাঁহারা পরস্পর কথা বলিতে পারিতেন, একের মনের ভাব অন্যের নিকট ব্যক্ত করিতে পারিতেন, পত্র লেখার কোন প্রয়োজনই ছিল না। পত্রখানিতে আছে—"হঠাৎ প্রয়োজন হইতে পারে বলিয়া ভারতের সর্বত্র 'মিষ্টদ্রব্য' (sweets) প্রস্তুত করিয়া

রাখিতে হইবে। আমি এখানে তোমার পত্রের প্রতীক্ষায় র[illegible]লাম।" বারীন অরবিন্দকে 'সেজদা' বলিয়া ডাকেন, ইহা সরকার পক্ষ [illegible] বলা হইয়াছে। এই পত্র লেখার সময় কি বারীন তাহা ভুলিয়া গিয়াছি[illegible]লেন? তিনি লিখিয়াছেন, 'প্রিয় দাদা'। এ-দেশে কোন ছোট ভাই পত্রে বড় ভাইকে 'প্রিয় দাদা' বলিয়া সম্বোধন করে না, কেবল [illegible] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ঐরূপ সম্বোধন করিতে পারে।

বিচারপতি—তাহারা কি লিখে?

মিঃ দাশ—মেজদা, সেজদা ইত্যাদি, কেবল সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রা[illegible]কে শুধু 'দাদা' বলিয়া থাকে। দুই ভ্রাতাই সুরাটে ছিলেন, সুতরাং বারীনের অরবিন্দকে এই পত্র লেখা নিতান্ত অসম্ভব।

পত্রের শেষে 'বারীন্দ্রকুমার ঘোষ' বলিয়া স্বাক্ষর রহিয়াছে, মাননীয় বিচারপতি ইহা লক্ষ্য করিবেন। সুবিজ্ঞ বন্ধুবর বলিয়াছেন, অরবিন্দ ও বারীন ইঙ্গভাবাপন্ন। কিন্তু বারীন এক বৎসর বয়সের সময় ভারতবর্ষে আসেন। আমি পনের বৎসর হইল বিলাত হইতে আসিয়াছি, [illegible]নি না ইতিমধ্যে সেখানকার রীতিনীতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না, কি[illegible] বিলাতে বাস করিবার সময় দেখিয়াছি যে, এক ভাই অন্য ভাইকে চিঠিপত্র [illegible] বার সময় কখনও পুরা নাম সহি করে না।

বিচারপতি—আমিও আমার পুরা নাম লিখি না, [illegible]খিটা বাদ দিই।

মিঃ দাশ—এরূপ স্থলে কেহ-ই এ রকম স্বাক্ষর করে না। ভ[illegible]কে চিঠি লিখিবার সময় 'বারীন্দ্রকুমার ঘোষ' এই রকম পুরা [illegible] লেখা রীতিবিরুদ্ধ।

এই 'মিষ্টির পত্রখানি' অরবিন্দ সযত্নে রক্ষা করেন। পত্র[illegible] কলি-

কাতায় লইয়া আসা হয়। ২৩ নং স্কট্স্ লেনে পত্রখানি প্রায় দুই মাস থাকে এবং পুলিস সৌভাগ্যক্রমে ইহা ৪৮ নং গ্রে ষ্ট্রীটে খুঁজিয়া পায়। এই সমস্ত ব্যাপারটাই যে অসম্ভব তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় পত্রখানিকে অরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য বা প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে বিচারপতি দ্বিধা বোধ করিবেন বলিয়াই আশা করি।

... ...

২রা মে শুধু ৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীটেই যে খানাতল্লাস হয় তাহা নয়, অন্যান্য বাড়ীতেও খানাতল্লাস হইয়াছিল। খানাতল্লাসে যে-সব জিনিষ পাওয়া যায়, তাহা পার্ক ষ্ট্রীট থানায় প্রেরিত হয়। কেবলমাত্র ৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ীর সম্বন্ধে পৃথক্ ব্যবস্থা করিবার কোন কারণ ছিল না। ১৫নং গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়ীর এবং বাগানের দলিলপত্রগুলিও পার্ক ষ্ট্রীট থানায় প্রেরিত হইয়াছিল। সেখানে খানাতল্লাসে প্রাপ্ত কাগজ-পত্রের মধ্যে 'মিষ্টির চিঠিখানা' পাওয়া ও তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা সম্বন্ধে সরকারপক্ষের সাক্ষীরা নানারূপ এলোমেলো কথাই বলিয়াছে। ঐ পত্রখানির সম্পর্কে আমার আর একটি মাত্র কথা বলিবার আছে। বিচারপতি দেখিতে পাইবেন যে, বাণ্ডিল বা পুঁটুলীর মধ্যে প্রাপ্ত চিঠির সংখ্যা পরে বাড়ান হইয়াছে। জেরার সময় মিঃ ব্রিগ্যান বলিয়াছেন, পত্রগুলি হয়ত খামের ভিতরে ছিল। আমি বলি, 'মিষ্টির পত্রখানি' পুঁটুলীর মধ্যে আদৌ ছিল না। দলিলপত্রের মধ্যকার চিঠির সংখ্যা ৬৪ খানার কম হইতে পারে না; ৬৪ খানি পত্র ও কুড়িখানি খাম ছিল।

...

এই বিচারের আদ্যন্ত আপনারা যে সহৃদয়তা ও ধৈর্য্যের সঙ্গে আমার বক্তব্য শুনিয়াছেন, সেজন্য আমি আপনাদিগকে—বিচারপতি মহাশয় ও

এসেসর (Assessor) মহোদয়গণকে—অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই মোকদ্দমা পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, তথাপি সে ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়। ইহার সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সুসম্বদ্ধ ভাবে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। এই বিচারের প্রারম্ভেই একটি বিষয় আমার বিশেষভাবে মনে হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আমি এ পর্য্যন্ত উল্লেখ করি নাই, কারণ মৌখিক ও লিখিত সকল প্রকার সাক্ষ্য-প্রমাণাদি আলোচনার পর উহা উল্লেখ করা অধিকতর সুবিধাজনক ও সুসঙ্গত হইবে বলিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম। বিচারপতি জানেন যে, বন্ধুবর অরবিন্দকে এই ষড়যন্ত্রের নেতা বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। তিনি অরবিন্দের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, গঠন ও কর্ম্ম পরিচালন ক্ষমতার (powers of organisation) সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছেন যে, অরবিন্দই পশ্চাতে থাকিয়া এই ষড়যন্ত্র চালাইয়াছেন। এখন বিচারপতি মহাশয়ের নিকটে আমার নিবেদন এই, যে ষড়যন্ত্রটি সত্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা চলিতেছে, সে ষড়যন্ত্র কোনদিন সফল হইবে, ইহা অরবিন্দ কখনই মনে করিতে পারেন না। বন্ধুবর পূর্ব্বে অরবিন্দের পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিশক্তির প্রশংসা করিয়াছেন। এখন যদি তিনি বলেন, তাঁহার সে কথার কোন মূল্য নাই, তাহা হইলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা—নতুবা বন্ধুবরের নিজের কথানুযায়ী-ই অরবিন্দের ন্যায় ব্যক্তি এইরূপ ষড়যন্ত্র সফল হইবে বলিয়া কখনই বিশ্বাস করিতে পারেন না। বন্ধুবর ঐ ষড়যন্ত্রের অসংখ্য শাখা প্রশাখার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, কলিকাতা হইতে টিউটিকোরিন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র একটি বিরাট ষড়যন্ত্র চলিতেছিল; এবং এই বিরাট ষড়যন্ত্রকে যথার্থ প্রমাণ করিবার জন্যই যেন তিনি এমন সকল লোকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

উত্থাপন করিয়াছেন, যাহাদের বিরুদ্ধে কিছুমাত্র সাক্ষ্য বা প্রমাণ নাই। আপনারা বন্ধুবরের এই সকল কথাই অগ্রাহ্য করিবেন, ইহাই আমার অনুরোধ। প্রকৃতপক্ষে ষড়যন্ত্রটি বন্ধুবরের কল্পনা-সম্ভূত। আমি বলিতেছি না যে, তিনিও ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না এবং তিনি যে-সকল কথা বলিয়াছেন, সে-সব কথার যথার্থতা সম্বন্ধে তাঁহার নিজেরই সন্দেহ আছে। আমি স্বীকার করিতেছি যে, তিনি এই ষড়যন্ত্রটিকে প্রকৃত বলিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন; কিন্তু তাঁহার এই মনোভাবের কারণ আমার এইরূপ মনে হয়—তিনি অনেক কাল পুলিসের হেপাজতে রহিয়াছেন, পুলিস বিগত দশ মাসে তাঁহার মনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহারই ফলে তিনি অকপটে ঐরূপ ষড়যন্ত্রের বিদ্যমানতায় বিশ্বাস করিয়া তদনুযায়ী সমস্ত বিষয়টি বিচারালয়ে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণাদি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথাই প্রকাশ পাইয়াছে। বিচারালয়ে যে-সব স্বীকারোক্তি করা হইয়াছে এবং যাহার উপর সরকার পক্ষ নির্ভর করিয়াছেন, তাহা হইতে আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা একটি নিতান্ত ছেলেমানুষি ষড়যন্ত্র, ছেলেখেলার বিপ্লব। দুই-একটি ইংরাজকে বোমা মারিয়া অথবা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কয়েকটি ইংরাজকে হত্যা করিয়া তাঁহারা ইংরাজ শাসনের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিবেন, এরূপ কথা অরবিন্দ কখনই বিশ্বাস করিতে পারেন না। যদি আপনারা অরবিন্দকে প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে আর তাঁহাকে এই ছেলেখেলার বিপ্লবের নেতা আপনারা বলিতে পারেন না। এই বিচারের প্রারম্ভেই এই সমস্যা বর্তমান রহিয়াছে।...সে-কথা ছাড়িয়া দিলেও আদালতে যে-সব স্বীকারোক্তি করা হইয়াছে তাহাও অরবিন্দকে নির্দোষ বলিয়া প্রমাণ করে। যদি বলা হয়, অনুসরণকারী গুপ্তচর

সাক্ষীরা (watch witnesses) বা অন্য সাক্ষিগণ অরবিন্দ ও ষড়যন্ত্র-কারীদের মধ্যে যোগাযোগ থাকা অকাট্যরূপে প্রমাণ করিয়াছে, তাহা হইলে আমি বলিব যে, সেই সাক্ষ্যগুলির উপরে কি ... আস্থা স্থাপন করা যায় না। কেবল তাহাই নয়, এইরূপ অবস্থায় সা...ও যে এইরূপই হয়, তাহা সকলেই জানে।* যদি সরকার মনে করেন ... সরকারের অস্তিত্ব বিলোপের জন্য একটি বিরাট ষড়যন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইলে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার মত গুপ্তচরের যে অভাব হয় না, ই ... সর্ব্বজনবিদিত। একজন বিখ্যাত বিচারক লিখিত একখানি গ্রন্থের ...কস্থানে আছে—"ঐ রকম অবস্থায় সরকারের বেতনভোগী গুপ্তচরেরা ...থ্যা ঘটনা সাজায়, লোকের বাড়ীতে নানারূপ চিঠিপত্র ফেলিয়া আসে, সেখান হইতে চিঠিপত্র চুরি করে এবং চিঠিপত্র জালও করিয়া থাকে।" সুতরাং এই প্রকার বিচারে যেরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ সাধারণতঃ প্রদত্ত হয়, এই বিচারেও সেইরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণই আপনাদের নিকটে উপস্থিত করা হইয়াছে।

আমার মনে হয়,সাবধানতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, আপনারাও নিশ্চয়ই ঐ সাক্ষ্যগুলিকে অবিশ্বাসযোগ্য বোধে অগ্রাহ্য করিবেন। এই মোকদ্দমায় যে-সকল পত্র দাখিল করা হইয়াছে, তাহা... উ...র নির্ভর করিয়া সরকার পক্ষ অরবিন্দ কোনপ্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এরূ... ...া বলিতে চাহেন কি? কিন্তু এই পত্রগুলি হইতে ঐরূপ কিছুই প্রমাণ ... না। পত্রগুলির অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া বন্ধুবর কয়েকটি বালকের সঙ্গে ... ...দের যোগাযোগ থাকা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, ইহাতে সমস্ত ব্যা... ...স্তকর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি পত্রগুলিতে নিজের নিতান্ত ... অর্থ আরোপ করিতে চাহেন। আমি জোরের সঙ্গে বলিতে...—ঐ চিঠিপত্রগুলি পড়িয়া উহার স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ করিলে এবং ... যে অবস্থায় উহা

লিখিত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে আপনারা বেশই বুঝিতে পারিবেন যে, অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে আনীত কোন অভিযোগই উহার দ্বারা প্রমাণিত হয় না।

বন্ধুবর তাহা কতক পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াই যেন হতাশ হইয়া বলিয়াছেন, 'চিঠিপত্র যাক্, সাক্ষ্য-প্রমাণ যাক্, কিন্তু যাহা সম্ভব তাহা দেখুন, এই মানুষটির চিন্তাধারার প্রতি লক্ষ্য করুন।' এই জন্যই তিনি অনেক সংবাদপত্র এখানে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং এ-দেশের অনেক সুশিক্ষিত লোক ও নেতার বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড এক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি সংক্ষেপতঃ আপনাদিগকে এইরূপ বলিয়াছেন, "বন্দেমাতরম" পাঠ করুন, অরবিন্দের বিভিন্ন বক্তৃতাগুলি পাঠ করুন, অন্যান্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁহার রচনাগুলি পাঠ করুন, তাহা হইলেই তাঁহার চিন্তাধারা বুঝিতে পারিবেন। ঐ রচনা ও বক্তৃতাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া যদি আপনাদের মনে হয় যে, এই লোকটি দেশে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিতেছেন, তাহা হইলে এই বিচারে প্রকাশিত বোমা, গুপ্তসমিতি ও অন্যান্য অবৈধ উপায় প্রয়োগ করিবারও তিনি পক্ষপাতী, ইহাও আপনাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।" আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং আবারও বলিতেছি, এই সকল সংবাদপত্র, রচনা ও বক্তৃতা আইনতঃ এই মোকদ্দমায় প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। তথাপি যদি আপনারা এইগুলিকে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করেন, তাহা হইলেও আপনারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, অরবিন্দের মতামত যাহাই হউক না কেন, তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। বিচারপতি মহাশয়ের নিকট আমি অরবিন্দের ১৯০৫ সালের ১৩ই আগষ্ট তারিখে লিখিত পত্রখানা পেশ করিয়াছি।

সমস্ত পত্রখানি আমি আপনাদের পড়িয়াও শুনাইয়াছি এবং তাহার ভিতরকার সকল ভাবগুলির ব্যাখ্যাও করিয়াছি। অরবিন্দ তাঁহার বর্ণনাপত্রে (Statement) যাহা বলিয়াছেন, এখনও সেই কথাই বলিতেছেন—অর্থাৎ বরোদা হইতে কলিকাতা আসিয়া এক মুহূর্তের জন্যও তিনি ঐ পত্রে উল্লিখিত আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই।...তিনি দেশে স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন—তাহা যদি আইন-বিরুদ্ধ হয়, তবে তিনি সে দোষ স্বীকার করিতেছেন এবং তদনুযায়ী শাস্তি গ্রহণেও প্রস্তুত আছেন। কিন্তু যে-সব অপরাধ তিনি করেন নাই, সে-সব অপরাধ তাঁহার উপর চাপাইবেন না। ঐ-সব অপরাধ তাঁহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং তাঁহার ন্যায় মনোবৃত্তিশালী লোকের পক্ষে ঐরূপ অপরাধ করা একান্ত অসম্ভব। যদি স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করাই আইনতঃ দোষের হয়, তবে তিনি সে দোষ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিতেছেন —তিনি কোনদিনই ইহা অস্বীকার করেন নাই। এই আদর্শের জন্যই তিনি তাঁহার সাংসারিক জীবনের সমস্ত উন্নতির আশা ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার জন্য কাজ করিয়া জীবন কাটাইবেন বলিয়াই তিনি কলিকাতায় আসেন। ইহাই তাঁহার জাগ্রত অবস্থার একমাত্র চিন্তা ও নিদ্রিত অবস্থার স্বপ্ন। যদি ইহাই তাঁহার অপরাধ হয়, তাহা হইলে প্রমাণের জন্য সাক্ষীদের অনর্থক কাঠগড়ায় দাঁড় করাইবার প্রয়োজন ছিল না। তিনি নিজেই এই অপরাধ স্বীকার করিতেছেন। তাঁহার একমাত্র নিবেদন এই যে, 'বন্দেমাতরম' রাজদ্রোহ মামলা বিচারের প্রহসন যেন এই বিচারের কালেও পুনরায় অভিনীত না হয়। যদি উহাই তাঁহার অপরাধ হয়, তবে সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হউক, তিনি সানন্দে যে-কোন শাস্তি গ্রহণ করিবেন। যে-সকল অপরাধের বিষয় তিনি কখনও কল্পনাও করিতে

পারেন না, যে-সকল কাজ তাঁহার একান্ত প্রকৃতিবিরুদ্ধ সেই সকল অপরাধ ও কাজ শুধুমাত্র নিতান্ত অবিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়া নহে, উপরন্তু তাঁহারই রচনার অপব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহার উপরে আরোপ করা হইয়াছে। ইহাতে তিনি মর্মাহত হইয়াছেন। ঐ রচনাগুলি একমাত্র সেই মহান্ আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত যে আদর্শ প্রচার করিবার আহ্বান তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছেন।...তিনি বেদান্তের চিরন্তনী বাণীর সহিত পাশ্চাত্য রাজনীতির মূলতত্ত্বের (Political Philosophy) সমন্বয় সাধন করিয়া তাহা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, জগতের জাতিসঙ্ঘে ভারতেরও যে বিশেষ কিছু দান করিবার আছে, ইহা দেশবাসীর নিকটে তাঁহাকেই প্রচার করিতে হইবে। যদি তাহাই তাঁহার অপরাধ হয়, তবে আপনারা তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে, কারারুদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি সে অপরাধ কখনই অস্বীকার করিবেন না। তিনি বেশ জোরের সঙ্গেই বলিতেছেন যে, স্বাধীনতার সেই আদর্শ প্রচার করিয়া আইনতঃ কোন অপরাধই তিনি করেন নাই; যে সকল কার্য্যের জন্য তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহাও কিছুমাত্র প্রমাণিত হয় নাই; এবং তিনি যাহা প্রচার করিয়াছেন, যাহা-কিছু লিখিয়াছেন তাহার সহিতও ঐ-সকল কার্য্যের বিন্দুমাত্র ঐক্য নাই—উহা তাঁহার একান্ত প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

আপনাদিগের নিকটে আমার নিবেদন এই যে, এই মানুষটির বিচার আজ কেবলমাত্র এই বিচারালয়েই চলিতেছে না, ইতিহাসের দরবারেও (High Court of History) তাঁহার বিচার চলিতেছে। এই বিচার সম্পর্কে আমাদের তর্কবিতর্ক একদিন নীরবতায় পর্য্যবসিত হইবে, এই আন্দোলন ও উত্তেজনারও একদিন অবসান হইবে, অরবিন্দও একদি

পরলোকে প্রয়াণ করিবেন, কিন্তু তাহার অনেক কাল পরেও তাঁহাকে সকলে দেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তার ঋষি এবং বিশ্বপ্রেমিক বলিয়া স্বীকার করিবে। তাঁহার মৃত্যুর বহুকাল পরেও তাঁহার বাণী দেশ-দেশান্তরে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হইবে। সেইজন্যই আমি বলিতেছি যে, আজ কেবল এই বিচারালয়েই তাঁহার বিচার চলিতেছে না—ইতিহাসের দরবারেও তাঁহার বিচার চলিতেছে। মাননীয় বিচারপতি মহাশয়, আপনার রায় দিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে; ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদেরও অভিমত প্রকাশ করিবার সময় উপস্থিত। ইংরাজের বিচারালয়ের কথাই ইংরাজ জাতির ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয়—সেই বিচারালয়ের চির-অনুসৃত রীতি-নীতির (traditions) নামে আমি বিচারপতি মহাশয়ের নিকট সুবিচার প্রার্থনা করিতেছি। ইংরাজের বিচারালয় হইতে আইনের যে অসংখ্য মূলনীতি প্রচারিত হইয়াছে, তাহার মহত্তম নীতিগুলির নামে আমি বিচারপতি মহাশয়ের নিকটে সুবিচার প্রার্থনা করিতেছি। যে সকল প্রসিদ্ধ ইংরাজ বিচারক তাঁহাদের প্রদত্ত আইনের বিধানদ্বারা বিচার-প্রার্থিগণের আন্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন, সেই সমদর্শী মহাপুরুষগণের নামে আমি বিচারপতি মহাশয়ের নিকটে সুবিচার প্রার্থনা করিতেছি। আমি পুনরায় ইংরাজ জাতির ইতিহাসের সেই গৌরবময় অধ্যায়ের নামে বিচারপতি মহাশয়ের নিকটে সুবিচার প্রার্থনা করিতেছি—এবং আশা করি এই বিচার সম্পর্কে এমন কথা কেহ বলিতে পারিবে না যে, একজন ইংরাজ বিচারক ন্যায় বিচারে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। আর ভদ্রমহোদয়গণ, অরবিন্দ যে আদর্শ প্রচার করিয়াছেন, সেই আদর্শের নাম লইয়া এবং আমাদের দেশের চিরাচরিত প্রথাগুলির (traditions)

নামে আপনাদের নিকটে সুবিচার প্রার্থনা করিয়া আমি বলিতেছি, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা যেন না বলিতে পারে যে, অরবিন্দেরই দুইজন স্বদেশবাসী আক্রোশ ও পক্ষপাত বশে সাময়িক কলরব ও আন্দোলনের নিকটে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন।

৮

কারামুক্তির পরে

মুক্তিলাভ করিয়া অরবিন্দ বাহিরে আসিলেন বটে, কিন্তু তিনি আর পূর্ব্বের অরবিন্দ ছিলেন না। গভীর ধর্ম্ম-পিপাসা তাঁহার চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল; এক নূতন মানুষ হইয়া তিনি দেশমাতার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিলেন। কিছুকাল বিশ্রামের পর তিনি পুনরায় 'কর্ম্মযোগিন্' নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র ও 'ধর্ম্ম' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই পত্রিকা দুইখানিতে অরবিন্দ বিশেষ ভাবে আর্য্যধর্ম্ম সম্বন্ধে গভীর তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ধর্ম্ম ও প্রকৃত জ্ঞানচর্চ্চার পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই ভারতবর্ষের যে আজকাল এই দুরবস্থা হইয়াছে, এবং ভারতবর্ষকে সেই ঋষিলব্ধ সত্যগুলিকে পুনরায় উপলব্ধি করিতে হইবে, ইহাই অরবিন্দ প্রচার করিতে লাগিলেন।

দেশের চারিদিকে তখন নির্যাতন প্রবলবেগে চলিতেছে—বাংলার গণ্যমান্য কয়েকটি সুসন্তান নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। অরবিন্দ তীব্রভাষায় এই নির্ব্বাসনের প্রতিবাদ করিলেন। সরকার তখন দেশের সভা-সমিতি বন্ধ করিতেছিলেন, তিনি তাহারও প্রতিবাদ করিলেন। এই নির্যাতনের মধ্যেও ভগবানের শুভ ইচ্ছা রহিয়াছে বুঝিতে পারিয়া তিনি দেশবাসীকে নির্ভীকভাবে আন্দোলন চালাইতে বলিলেন।

১৯০৯ সালে হুগলীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন হয়।

এই সময়ে দেশের চতুর্দ্দিকে আতঙ্ক ও নিষেধের জাল বেষ্টিত ছিল। সভা-সমিতিগুলি তখন নরমপন্থীদেরই করায়ত্ত। তাঁহাদের ইচ্ছামত প্রস্তাবাদিই উহাতে প্রতি বৎসর গৃহীত হইত। তাঁহারা কখনও কখনও সরকারের অন্যায় বিধি-নিষেধ ও কার্য্যাবলীর মৃদু প্রতিবাদ করিলেও কার্য্যতঃ তাহা অমান্য করিতেন না। এই সময়ে বাংলায় রিজ্‌লী সার্কুলার (Risley Circular) দ্বারা সরকার স্কুল-কলেজের ছাত্রদের রাজনৈতিক কোন কার্য্যে যোগদান করিতে নিষেধ করেন। হুগলী প্রাদেশিক সম্মিলন কর্ত্তৃপক্ষও সেই আদেশ মান্য করিয়া ছাত্রদের তাহাতে যোগদান করিতে নিষেধ করিলেন। অরবিন্দ এই সকল ভীরুতা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি নির্ভীক ভাবে 'জাতীয়তাবাদী' নির্ভীক দেশভক্তদের সজ্যবদ্ধ করিলেন এবং সভার সম্মুখে তাঁহার প্রস্তাবাদি উপস্থাপিত করিলেন। 'রিজ্‌লী সার্কুলার' অমান্য করিয়া ছাত্র ও অধ্যাপকদের দেশসেবার কার্য্যে আহ্বান করিলেন। অরবিন্দ তখন সত্যদ্রষ্টা, ভগবানে আত্মসমর্পিত দেশ সেবক। প্রাদেশিক সম্মিলনে তাঁহার প্রস্তাবাদি বিনা বাধায় গৃহীত হইল, উপরন্তু নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে সভায় কোন বিভেদ রহিল না। যাঁহার সত্য দৃষ্টি লাভ হইয়াছে, তাঁহার সম্মুখ হইতে মিথ্যা স্বয়ং পলায়ন করে। অরবিন্দের আধ্যাত্মিক জীবনের স্পর্শে সকল ভীরুতার অবসান হইল। দেশসেবা ভগবানেরই প্রিয়কার্য্য, এই সত্য দেশে প্রতিষ্ঠিত হইল।

এই সম্মিলনীর পর অরবিন্দ তাঁহার আদর্শ প্রচার করিবার জন্য পূর্ব্ব-বঙ্গের নানা স্থানে ভ্রমণ ও তথায় নানা বিষয়ে বক্তৃতাদি করেন। বরিশালের পথে ঝালকাঠি নামক স্থানে তিনি একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতাগুলি বাঙালীর আদরের সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে। কারাবাসের পর হইতেই অরবিন্দের বক্তৃতাগুলির মধ্যে তেজস্বিতা ও

ধর্ম্মজীবনের সুস্পষ্ট পরিচয় লক্ষিত হইতে লাগিল। নূতন মানুষ অরবিন্দ প্রত্যেকটি কাজ ভগবানের কাজ বলিয়া মনে করিতেন, ভগবানেরই বাণী যেন তাঁহার বক্তৃতায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিত।

জেল হইতে বাহির হইয়াই উত্তরপাড়ার একটি ধর্ম্মসভায় তিনি যে মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতাটি করেন, তাহা চিরকাল দেশপ্রেমিক যুবকদের মনে শক্তিসঞ্চার করিবে। এই অভিভাষণে তিনি তাঁহার কারাবাসকালীন ধর্ম্মজীবনের সুন্দর বর্ণনা করেন। ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহার মঙ্গলের জন্যই যে তিনি কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং সেই সময়ে তাঁহার যে ভগবৎ উপলব্ধি হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন।—ভারতবর্ষের মুক্তি চাই, কিন্তু সে মুক্তি ভারতবর্ষের স্বার্থের জন্য নহে, তাহা জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য। উদার সনাতন ধর্ম্মকে প্রচার করিবার জন্যই ভারতের মুক্তির প্রয়োজন এবং ভারত-ভাগ্য বিধাতা তাহারই জন্য ভারতে এই স্বাধীনতার আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা কোন মানুষের অপেক্ষা রাখিবে না, জগতের কল্যাণের জন্য স্বয়ং বাসুদেব এই মুক্তি আনয়নের সর্ব্বপ্রকার পন্থা নির্দ্দেশ করিবেন। চতুর্দ্দিকে বাধা, অন্ধকার, নৈরাশ্য, কিন্তু মাভৈঃ—সকলই বিধাতার বিধানে হইতেছে—ভারতের মুক্তিলাভ হইবেই—তাহার গতিরোধ করিবার শক্তি কোন মানুষের নাই।

দেশময় তখন যে অবসাদের অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছিল, অরবিন্দ তাহার মধ্যে আলোকহস্তে পথ দেখাইতেছিলেন। ঝালকাঠিতে তিনি যে সুন্দর বক্তৃতাটি দিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মও ঐরূপ। সেখানেও তিনি দেশের তদানীন্তন অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া বলেন যে, সরকারের উৎপীড়ন নীতি আমাদের মঙ্গলেরই জন্য—ইহা 'hammer of God' (মঙ্গলময়ের

হাতুড়ীর আঘাত মাত্র)।........রাজপুরুষেরা জানেন না যে, মহৎ ব্যক্তি হইলেও অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় এই আন্দোলনের নেতা নহেন, তিলকও এই আন্দোলনের নেতা নহেন—এই আন্দোলনের নেতা স্বয়ং ভগবান। রাজপুরুষেরা আরও জানেন না যে, দেশের উপর দিয়া যে প্রবল বাত্যা বহিয়া যাইতেছে, তাহা তাঁহাদের সৃষ্ট নহে, স্বয়ং ভগবান তাঁহার মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তাহা প্রেরণ করিয়াছেন। এই বাত্যার বিক্ষুব্ধ হইলে চলিবে না, ইহাকে নীরবে সহ্য করিতে হইবে। আমাদের দেশবাসীকে ইহা সহ্য করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ধর্ম্মসাধনার জন্য অলৌকিক কষ্ট স্বীকার করিয়া তপস্যা করিয়াছেন। আমাদেরই জননীরা স্বামীর সঙ্গে পরলোক গমনের জন্য হাস্যমুখে চিতার আরোহণ করিয়াছেন। সুতরাং সহিষ্ণুতা আমাদের অস্থি-মজ্জাগত।

ঝালকাঠিতে অরবিন্দ পুনরায় বলেন যে, আমাদের স্বরাজ লাভ আমাদের জাতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামগ্রী ধর্ম্মকে লাভ করিবার জন্য, স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য নহে। স্বরাজ বলিতে আমরা মনে করি না যে, দেশবাসী ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে, অথবা বোমায় দেশ ছাইয়া যাইবে। ...স্বরাজ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বা কোন প্রকার শাসনপদ্ধতি মাত্র নহে, আমাদের জাতীয় জীবনের পূর্ণতা সাধনই স্বরাজের আদর্শ।

এই পূর্ণতা সাধনের উপায় সম্বন্ধে অরবিন্দ বলিয়াছেন, হিংসার পন্থা আমাদের পন্থা নহে। বাণিজ্য, শিল্প, রাজনীতি, শিক্ষা, শাসনপদ্ধতি এবং সর্ব্বপ্রকার জাতীয় অনুষ্ঠানে 'স্বদেশী' মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে— অর্থাৎ জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইবে। স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য বলিলেই যে 'বোমা' বা 'বিপ্লব' বুঝায় তাহা নহে। কর্ত্তৃপক্ষ যদি উন্মাদের ন্যায় জাতীয় শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষাকেও বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন,

তাহা হইলে বিপ্লব বা বোমার নীতি নষ্ট করা হইবে না, বরং তাঁহারাই দেশে বিপ্লবের সৃষ্টি করিবেন। প্রত্যেক জাতি তাহার প্রাথমিক অধিকারগুলি লাভ করিবে, ইহা ভগবানের বিধান, সুতরাং সে বিধানের বিরুদ্ধে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ কার্য্যকরী বা সফল হইতেই পারে না এবং লোকে সে আদেশ অমান্য করিবেই।

আমাদের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা লাভ করিবার চেষ্টাকে যদি অপরাধ বলা হয়, তাহা হইলে সে অপরাধ অরবিন্দ স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহার জন্য সকল প্রকার শাস্তি গ্রহণ করিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কারণ, 'স্বাধীনতা'ই তাঁহার এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদের মন্ত্র, বিপ্লব বা বিদ্রোহ তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে।

স্বাধীনতা লাভের জন্য দেশবাসীকে সকল নির্যাতন সহ্য করিতে অনুরোধ করিয়া অরবিন্দ তাঁহার ঝালকাঠির বক্তৃতার উপসংহারে বলেন— (ঝটিকা প্রবলতর বেগে পুনরায় আমাদের উপরে আসিতে পারে। তখন ইহা মনে রাখিও, সাহসের সঙ্গে সেই ঝটিকার সম্মুখীন হইও, আত্মশক্তিতে আস্থাবান হইয়া ঝটিকার সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিও এবং সেই শক্তিদ্বারা দেশমাতার মন্দিরকে সযত্নে রক্ষা করিও।)

৯

পণ্ডিচারী-প্রয়াণ

পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া অরবিন্দ, কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। প্রায় এক বৎসর কাল তিনি সাপ্তাহিক পত্রিকা দুইখানি প্রকাশ করেন। কিন্তু ক্রমেই তাঁহার ধর্ম্মজীবন যাপনের আগ্রহ প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল। অবশেষে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি তাঁহার প্রিয় কর্ম্মভূমি বাংলা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ ভারতবর্ষের পণ্ডিচারী নামক ফরাসী অধিকৃত স্থানে নির্জ্জন সাধনার জন্য গমন করেন। তদবধি তিনি তথায় সেই নির্জ্জন সাধনাতেই রত আছেন।

পুষ্প যেখানেই গন্ধ বিতরণ করে, মৌমাছির দল আপনা হইতেই সেখানে আসিয়া মিলিত হয়, তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিতে হয় না। সেইরূপ কিছুকাল পরেই সুদূর পণ্ডিচারীতেও ধীরে ধীরে ধর্ম্মপিপাসু নরনারী আসিয়া অরবিন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এখন পণ্ডিচারীতে অরবিন্দের গৃহে আপনা হইতেই একটি 'সাধনাশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই আশ্রমে ভারতীয় ও ইউরোপীয় নরনারী জ্ঞান ও ধর্ম্ম সাধনায় ব্যাপৃত আছেন।

অরবিন্দের পণ্ডিচারী প্রস্থানের পরই পুনরায় সরকার তাঁহার বিরুদ্ধে একটি রাজদ্রোহের মামলা আনয়ন করিলেন। অরবিন্দ পণ্ডিচারীতে আছেন ইহা জানিয়াও সরকার পক্ষ হইতে তাঁহাকে Absconder বা পলাতক আখ্যা দান করিয়া তাঁহার নামে কলঙ্ক আরোপের চেষ্টা করা হয়। তাহার উত্তরে অরবিন্দ মাদ্রাজ টাইমস্ (Madras Times) পত্রিকায় বলেন

যে, ইহা রাজপুরুষগণের 'after-thought'—অর্থাৎ তাঁহারা অরবিন্দের পণ্ডিচারী অবস্থান ও তথায় তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সকল কথা জানিয়াও ঐ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন; এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি যোগ সাধনার জন্য পণ্ডিচারী আসিয়াছেন, সুতরাং ন্যায়তঃ তিনি কাহারও কাছে কোনও প্রকার জবাবদিহি করিতে বাধ্য নহেন।

যাহা হউক, অরবিন্দের পণ্ডিচারী প্রস্থান সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ আছে। একদল যুবক অরবিন্দের এই প্রস্থানকে রহস্যময় মনে করেন। তাঁহারা মনে করেন যে, আমাদের দেশে যেমন কর্ম্মহীন সন্ন্যাস ও সংসারত্যাগ পূর্ব্বাপর আছে, ইহাও তাহারই অনুরূপ। কিন্তু অরবিন্দের সংসারত্যাগ বা কর্ম্মক্ষেত্রত্যাগ আপনার মুক্তিলাভের জন্য নহে—সমগ্র মানবের তথা স্বদেশবাসীর মুক্তিলাভের পন্থা আবিষ্কারই তাঁহার নির্জ্জন সাধনার উদ্দেশ্য। ইহাকে সুদূর পণ্ডিচারীর নৈষ্কর্ম্ম বলিয়া হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিলে আমাদেরই বুদ্ধিহীনতার ও অজ্ঞতার পরিচয় দান করা হইবে। দৃঢ় ভিত্তির উপর মানুষের দেহমনকে স্থাপন করিয়া নূতন মানুষ সৃজন করিবার জন্যই এই সাধনা। ইহার দ্বারা মানুষ কর্ম্মশক্তি হারাইবে না,—মানুষ নূতন আধার লইয়া, নূতন শক্তিতে, সোৎসাহে জগতে অপূর্ব্ব কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিবে।

১৯১০ সালে অরবিন্দ পণ্ডিচারীতে গমন করেন। ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত তাঁহার সম্বন্ধে বঙ্গদেশে বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ১৯১৪ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে অরবিন্দের সম্পাদিত 'আর্য্য' নামক ইংরাজী মাসিক দার্শনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'আর্য্য' পত্রিকায় অরবিন্দের দার্শনিক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া দেশবাসী বুঝিল যে, অরবিন্দের সাধনা আত্মতৃপ্তিমাত্র নহে। পূর্ব্বের ন্যায় এখনও স্বদেশের

চিন্তা তাঁহার মনপ্রাণ জুড়িয়া আছে। তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধগুলি এমন সুন্দর ভাবে লিখিত যে, ইহা পাঠ করিলে কেবল ধর্ম্মপ্রবণ ব্যক্তি নহেন, দেশসেবকও কর্ম্মে প্রেরণা লাভ করিবেন। 'আর্য্য'-পত্রিকার প্রবন্ধগুলিতে তিনি বেদ উপনিষদের সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রাচ্যের যোগ সাধনার সকল রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য ইতিহাস ও শিল্পকলা ইত্যাদির বিচিত্র আলোচনাও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। অরবিন্দ লিখিত কতকগুলি অনুপম ইংরাজী কবিতাও এই সময় প্রকাশিত হয়। ইহার অধিকাংশই বহুদিন পূর্ব্বে বরোদায় বাস কালে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে অরবিন্দের ধর্ম্মসাধনা আরও গভীরতর হওয়াতে, বাধ্য হইয়া তিনি 'আর্য্য' পত্রিকার সম্পাদনা ত্যাগ করেন।* তদবধি প্রগাঢ় সাধনায় তিনি অদ্যাপি মগ্ন আছেন। শোনা যায়, তিনি বিশেষ কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না। সুদূর বিদেশ হইতে আগত অনেক মহৎ লোকের ভাগ্যেও তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। কতবার, কতভাবে দেশবাসী তাঁহাকে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছে, কতবার তাঁহাকে কংগ্রেসের সভাপতি পদে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, কিন্তু তিনি সাধনা-বিচ্যুত হন নাই। দেশের ও বিদেশের সকল সম্মানের—মোহের ঊর্দ্ধে তিনি তপস্যায় মগ্ন থাকিয়া যেন বারম্বার শাক্যমুনিরই ন্যায় বলিতেছেন, 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্'—অর্থাৎ এই আসনে আমার শরীর নষ্ট হইয়া

---

* ১৯১৪-১৯২১ পর্য্যন্ত সাড়ে ছয় বৎসর কাল 'আর্য্য' প্রকাশিত হয়। উহাতে অরবিন্দ লিখিত **Isha Upanishad, Essays on the Gita, Life Divine** ও **Synthesis of Yoga** ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

যাউক্, কিন্তু সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করিলে এই আসন ত্যাগ করিব না। এই স্থলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রচিত 'গুরু গোবিন্দ' নামক কবিতার কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। কর্ম্ম-কোলাহল ত্যাগ করিয়া শিখগুরু গোবিন্দ সাধনায় মগ্ন, শিষ্যগণ তাঁহাকে পুনরায় তাঁহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। শিষ্যগণের আহ্বানে গুরু গোবিন্দ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা আজ অরবিন্দের মুখ হইতেও নির্গত হইতে পারে।—

"বন্ধু, তোমরা ফিরে যাও ঘরে
এখনো সময় নয়।—
নিশি অবসান, যমুনার তীর,
ছোট গিরিমালা, বন সুগভীর;
গুরু-গোবিন্দ কহিল ডাকিয়া
অনুচর গুটি ছয়।

"যাও রামদাস, যাও গো লেহারী,
সাহু ফিরে যাও তুমি।
দেখায়ো না লোভ, ডাকিও না মোরে
ঝাঁপায়ে পড়িতে কর্ম্ম-সাগরে,
এখনো পড়িয়া থাক্ বহুদূরে
জীবন-রঙ্গ-ভূমি।

"মানবের প্রাণ ডাকে যেন মোরে
সেই লোকালয় হ'তে।

সুপ্ত নিশীথে জেগে উঠে, তাই
চমকিয়া উঠে বলি 'যাই, যাই,'
প্রাণ মন দেহ ফেলে দিতে চাই
প্রবল মানব-স্রোতে।

"তোমাদের হেরি' চিত্ত চঞ্চল,
উদ্দাম ধায় মন।
রক্ত-অনল শত শিখা মেলি'
সর্প সমান করি' উঠে কেলি,
গঞ্জনা দেয় তরবারি যেন
কোষমাঝে ঝন্‌ঝন্।

"হায়, সে কি সুখ, এ গহন ত্যজি'
হাতে ল'য়ে জয়তুরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে,
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি!

*　　　　*　　　　*

"থাক্ ভাই, থাক্, কেন এ স্বপন,
এখনো সময় নয়!

এখনো একাকী দীর্ঘ রজনী
জাগিতে হইবে পল গণি' গণি'
অনিমেষ চোখে পূর্ব্ব গগনে
দেখিতে অরুণোদয়।

"এখনো বিহার কল্প-জগতে,
অরণ্য রাজধানী।
এখনো কেবল নীরব ভাবনা,
কর্ম্মবিহীন বিজন সাধনা,
দিবানিশি শুধু ব'সে ব'সে শোনা
আপন মর্ম্মবাণী।

"একা ফিরি তাই যমুনার তীরে,
দুর্গম গিরি মাঝে।
মানুষ হ'তেছি পাষাণের কোলে,
মিশাতেছি গান নদী-কলরোলে,
গড়িতেছি মন আপনার মনে,
যোগ্য হ'তেছি কাজে।

এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ,
আরো কতদিন হবে,
চারিদিক হ'তে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি' আহরণ

শ্রীঅরবিন্দ

আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে!

"কবে প্রাণ খুলে' বলিতে পারিব—
'পেয়েছি আমার শেষ!
তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগ রে সকল দেশ!

"নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
নাহি আর আগুপিছু!
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ,
নাই তা'র কাছে জীবন মরণ,
নাই নাই আর কিছু!'

"হৃদয়ের মাঝে পেতেছি শুনিতে
দৈববাণীর মত—
'উঠিয়া দাঁড়াও আপন আলোতে,
ওই চেয়ে দেখো কতদূর হতে
তোমার কাছেতে ধরা দিবে ব'লে
আসে লোক কত শত।

শ্রীঅরবিন্দ

"ওই শোন, শোন, কল্লোল-ধ্বনি,
ছুটে হৃদয়ের ধারা।
'স্থির থাকো তুমি, থাকো তুমি জাগি
প্রদীপের মত আলস তেয়াগি,'
এ নিশীথ মাঝে তুমি ঘুমাইলে
ফিরিয়া যাইবে তা'রা।'

"যাও ভবে সাহু, যাও রামদাস,
ফিরে যাও সখাগণ!
এস দেখি সবে যাবার সময়
বল দেখি সবে গুরুজীর জয়,
দুই হাত তুলি' বল জয় জয়
অলখ নিরঞ্জন।"

অরবিন্দের এই সাধনা স্বার্থপ্রণোদিত নহে। তিনি বুঝিয়াছেন যে, দেশকে বাঁচাইতে হইলে নিজের শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। এই জ্ঞানহীন উন্মার্গ দেশকে উদ্ধার করিবার কাজে নিয়োজিত হইবার পূর্ব্বে আত্মস্থ হইতে হইবে। জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোকে আপনাকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিতে হইবে। সাময়িক উত্তেজনা প্রসূত রাজনৈতিক আন্দোলনে কিছুটা কাজ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে জাতির প্রাণ সাড়া দেয় না—জাতি জাগে না। তাই সুদূর পণ্ডিচারীর নির্জ্জনতার মধ্যে অরবিন্দ আজ ধ্যানস্থ—ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞান ও ধর্ম্মের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের জন্য আজ তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প। পাশ্চাত্য-

শিক্ষাভিমানী, চঞ্চলপ্রকৃতি আমরা ক্ষণিক উত্তেজনার বশে হয় ত মনে করি, কেবলমাত্র আমরাই দেশসেবা করিতেছি, আর অরবিন্দ স্বার্থপরের ন্যায় যোগাসনে বসিয়া আছেন এবং গান্ধী সবরমতীতে আশ্রম স্থাপন করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষকে প্রাচীনতার দিকে পিছাইয়া দিতেছেন। কিন্তু আমরা বুঝি না যে, আমাদের চঞ্চল কর্ম্মাড়ম্বর অপেক্ষা অরবিন্দের 'যোগাসন'-এর কর্ম্মশক্তি অনেক মহত্তর। সেই কর্ম্মশক্তির প্রেরণা যে কি প্রকার তাহা সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য। তথাপি ইহা খুবই সত্য যে, "গান্ধী মুনি ও অরবিন্দ পণ ক'রে তপস্যায় ব'সেছে। এই মরত যুগের বিষম মরা দেশকে তার হারনি মনটি ফিরে দেবে। অরবিন্দের এই হারান মন ফিরে দেবার ধারা বড় অভিনব, বড় অনুপম। তুমি আমি এমনি হাজার মানুষ যদি অন্তরে বাঁচি, কোনও অমৃত সিঁচে আপন মরা মন জীবন্ত ক'রে তুলি, তখন অন্তরের সে জীবন-হিল্লোল দেশ ভ'রে বসন্তস্পর্শের মত জাগ্‌বে, বাঁচাই তখন সংক্রামক হ'য়ে পড়বে। এত বড় অসাড় জাতিটার দুই চক্ষু ভিতরে ফিরে যখন তার দীনহীন অন্তরটাকে দেখ্‌বে, তখনই নবীন সৃষ্টির আরম্ভ। কারণ অন্তর্দ্দর্শী না হ'য়েই এ জাত ম'রেছে। এই কথা যেমন জাতির হিসাবে সত্যি, প্রতি মানুষের হিসাবেও তা' বড় সত্যি। আমরা ততক্ষণই ছোট ও স্বার্থপর থাকি যতক্ষণ আপনাকে না দেখি। ঘরের দিকে দশ দিন না চাইলে ঘর আবর্জ্জনায় ভ'রে যায়, মন্দিরে নিত্য পূজা না হ'লে মন্দির-চামচিকার বাথান হয়। আমাদের ঘটে ঘটে আজ চামচিকার বাথান। তাই বলি, ভাই, মন জাগাও। এই শবরূপা মাকে কাঁধে নিয়ে বৈরাগী বিশ্বম্ভর হ'য়ে কতকাল ত্রিলোক ঘুরবে? এই পুরাণ পচা সমাজ আচার ব্যবস্থারূপ মরাকে জ্ঞানের বিষ্ণুচক্রে খণ্ড খণ্ড ক'রে দিক্‌বিদিকে ছড়িয়ে

দাও। মা আমার নবরূপ ধ'রে নতুন শক্তি হ'য়ে ফিরে আসবে। মায়ের পুরাণ শরীরও তা' হ'লে ব্যর্থ যাবে না। নতুন দেশে নতুন মাটিতে সে জীবনের স্বর্গে যেখানে যেখানে মায়ের যে অঙ্গ পড়্‌বে সেখানে সেখানে পুণ্যতীর্থ র'চে উঠ্‌বে। নতুনের বুকে পুরাতনই সার্থক জীবনে জীবন্ত হবে। এ দেশকে জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তিতে অন্তর হ'তে বাঁচাও, বাহিরের মায়ায় ছুটে বেড়িও না। কর্ম্মের ডাক কা'কে দেবে? মন-মরা, জ্ঞান-মরা, শূক্তি-মরা কি ডাক শোনে?" (বিজলী—১৩২৭, ১২ই চৈত্র।)

অরবিন্দের পণ্ডিচারী প্রস্থানের পর হইতে তাঁহার সেখানকার জীবন-যাত্রা ও সাধন-পদ্ধতি সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানিতে অনেক বাঙালীই আগ্রহবান। তাঁহার ধর্ম্ম-সাধনার সকল পন্থা জানিবার সময় এখনও হয় নাই এবং এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার আলোচনা করাও সম্ভবপর নয়। তবে মধ্যে মধ্যে অরবিন্দ সম্বন্ধে তাঁহার পণ্ডিচারীস্থ ভক্তদের নিকট হইতে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। যাহা হউক, অরবিন্দের ভ্রাতা বারীন্দ্র দ্বীপান্তর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর অরবিন্দ পণ্ডিচারী হইতে ১৯২০ সালের ৭ই এপ্রিল তাঁহাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, বারীন্দ্র সেই সুন্দর পত্রখানি "অরবিন্দের পণ্ডিচারীর পত্র" নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়া দেশবাসীকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন; এই পত্রখানিতে অরবিন্দের আধুনিক মনোভাবের গভীর ও সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া ইহার কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

অরবিন্দ লিখিতেছেন, "পণ্ডিচারীই আমার যোগসিদ্ধির নির্দ্দিষ্ট স্থল—অবশ্য এক অঙ্গ ছাড়া; সেটা হচ্ছে কর্ম্ম। আমার কর্ম্মের কেন্দ্র বঙ্গদেশ, যদিও আশা করি তার পরিধি হবে সমস্ত ভারত ও সমস্ত পৃথিবী।"—

পত্রখানির এই কয়েকটি কথায় অরবিন্দের বাংলাদেশ-প্রীতি যে এখনও কত অকৃত্রিম ও গভীর তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

তার পর পত্রখানিতে অরবিন্দ যোগের পন্থার মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"পুরাতন যোগপ্রণালী অধ্যাত্ম ও জীবনের সামঞ্জস্য বা ঐক্য কর্‌তে পারেনি ; জগৎকে মায়া বা অনিত্য লীলা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। ফল হয়েছে জীবনশক্তির হ্রাস, ভারতের অবনতি। গীতায় যা' বলা হয়েছে 'উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্,' ভারতের 'ইমে লোকাঃ' সত্য সত্যই উৎসন্ন হয়ে গেছে। কয়েকজন সন্ন্যাসী ও বৈরাগী সাধু সিদ্ধ মুক্ত হয়ে যাবে, কয়েক জন ভক্ত প্রেমে, ভাবে, আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য কর্‌বে, আর সমস্ত জাতি প্রাণহীন, বুদ্ধিহীন হ'য়ে ঘোর তমোভাবে ডুবে যাবে, এ কিরূপ অধ্যাত্মসিদ্ধি ? আগে মানসিক level-এ (ভিত্তিতে) যত খণ্ড অনুভূতি পেয়ে মনকে অধ্যাত্মরসাপ্লুত, অধ্যাত্মের আলোকে আলোকিত কর্‌তে হয়, তার পর উপরে উঠা। উপরে অর্থাৎ বিজ্ঞানভূমিতে না উঠ্‌লে জগতের শেষ রহস্য জানা অসম্ভব ; জগতের সমস্যা solved (মীমাংসা) হয় না। সেখানেই আত্মা ও জগৎ, অধ্যাত্ম ও জীবন—এই দ্বন্দ্বের অবিদ্যা ঘুচে যায়। তখন জগৎকে আর মায়া বলে দেখতে হয় না ; জগৎ ভগবানের সনাতন লীলা, আত্মার নিত্য বিকাশ। তখন ভগবানকে পূর্ণভাবে জানা, পাওয়া সম্ভব হয় ; গীতায় যাকে বলে 'সমগ্রং মাং জ্ঞাতুম্'।"

এই যে সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসরেরও অধিককাল অরবিন্দ সাধনায় মগ্ন আছেন, তাহার লক্ষ্য কর্ম্ম হইলেও, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি কর্ম্মসিদ্ধির জন্য অস্থির নহেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন, "আমি কর্ম্মসিদ্ধির জন্য

অধীর নই। যা' হবার, ভগবানের নির্দ্দিষ্ট সময়ে হবে, উন্মত্তের মত ছুটে ক্ষুদ্র অহমের শক্তিতে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে প্রবৃত্তি নেই। যদি কর্ম্মসিদ্ধি নাও হয় আমি ধৈর্য্যচ্যুত হব না; এ কর্ম্ম আমার নয়, ভগবানের। আমি আর কারুর ডাক শুনব না; ভগবান যখন চালাবেন, তখন চল্‌ব।"

অরবিন্দের আদর্শ যে এখনও সংসার-ত্যাগের আদর্শ নয়, তাহার পরিচয়ও এই পত্রে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন—"(আমার যোগের) যারা সাধন করছে তাদের আগে অনেক পুরাতন সংস্কার ছিল, কয়েকটি খসেছে কয়েকটি এখনও আছে। আগে (তোমাদের) ছিল সন্ন্যাসের সংস্কার, অরবিন্দ-মঠ করতে চেয়েছিলে; এখন (তোমাদের) বুদ্ধি মেনেছে সন্ন্যাস চাই না, (কিন্তু) প্রাণে সেই পুরাতনের ছাপ এখনও একবারে মুছে যায়নি। সেই জন্য সংসারে থেকে ত্যাগী সংসারী হতে বল। তোমরা কামনা-ত্যাগের আবশ্যকতা বুঝেছ, কিন্তু কামনা ত্যাগ আর আনন্দভোগের সামঞ্জস্য পূর্ণভাবে ধরতে পারনি। আর আমার যোগটা নিয়েছিলে, যেমন বাঙ্গালীর সাধারণ স্বভাব—জ্ঞানের দিক থেকে তেমন নয়, যেমন ভক্তির দিকে, কর্ম্মের দিকে। জ্ঞান কিছু হয়েছে, অনেক বাকী আছে, আর ভাবুকতার কুয়াসা dissipated হয়নি—কাটে নি! তোমরা সাত্ত্বিকতার গণ্ডী পূরামাত্রায় কাটাতে পারনি, অহং এখনও রয়েছে; এক কথায় তার development (বিকাশ) হয়নি। আমারও কোন তাড়াতাড়ি নেই, আমি তোমাদের নিজের স্বভাব অনুসারে develop করতে দিচ্ছি। এক ছাঁচে সকলকে ঢালতে চাইনে। আসল জিনিষটাই সকলের মধ্যে এক হবে, নানা মূর্ত্তিতে ফুটবে। সকলে ভিতর থেকে grow করছে, গড়ে উঠছে। বাহির থেকে গঠন করতে চাইনে। তোমরা মূলটি পেয়েছ, আর সব আসবে।"

এই 'কামনা-ত্যাগ আর আনন্দভোগের সামঞ্জস্য', এই আদর্শই বর্ত্তমান যুগের প্রধান বাণী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাঁহার কাব্যে ভারতবর্ষের এই আদর্শকেই বারম্বার প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"—

বিশ্বের বিচিত্র বর্ণে, গন্ধে, রূপে সেই অরূপেরই প্রকাশ রহিয়াছে।

অরবিন্দ পরে ঐ পত্রখানির একস্থানে লিখিয়াছেন—"অরূপ যে মূর্ত্ত হয়েছে, সে নামরূপ গ্রহণ মায়ার খাম-খেয়ালি নয়; রূপের নিতান্ত প্রয়োজন আছে বলেই রূপ গ্রহণ; আমরা জগতের কোনও কাজ বাদ দিতে চাই না; রাজনীতি, বাণিজ্য, সমাজ, কাব্য, শিল্পকলা, সাহিত্য সবই থাকবে; এই সকলকে নূতন প্রাণ, নূতন আকার দিতে হবে।"

এই কথার পর প্রশ্ন উঠিবে, তবে অরবিন্দ রাজনীতি ত্যাগ করিলেন কেন? তাহার উত্তরও অরবিন্দ ঐ পত্রেই দিয়াছেন—"রাজনীতিকে ছেড়েছি কেন? আমাদের রাজনীতি ভারতের আসল জিনিষ নয় বলে, বিলাতী আমদানি, বিলাতী চঙের অনুকরণ মাত্র। তবে তারও দরকার ছিল; আমরাও বিলাতী ধরণের রাজনীতি করেছি; না করলে দেশ উঠত না; আমাদের experience (অভিজ্ঞতা) লাভ ও পূর্ণ development (বিকাশ) হতো না। কিন্তু এখন সময় এসেছে ছায়াকে বিস্তার না করে বস্তুকে ধরবার; ভারতের প্রকৃত আত্মাকে জাগিয়ে সকল কর্ম্ম তা'রই অনুরূপ করা চাই।"

সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে পত্রখানির অন্য স্থানে অরবিন্দ পুনরায় লিখিয়াছেন—"দেহকে শব দেখা সন্ন্যাসের নির্ব্বাণ-পথের লক্ষণ, এই ভাব নিয়ে সংসার করা যায় না, সর্ব্ববস্তুতে আনন্দ চাই—যেমন আত্মায় তেমনি দেহে। দেহ চৈতন্যময়, দেহ ভগবানের রূপ। জগতে যা' আছে তা'তে' ভগবানকে দেখলে, সর্ব্বমিদম্ ব্রহ্ম—বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি এই দর্শন পেলে বিশ্বানন্দ হয়। শরীরেও সেই আনন্দের মূর্ত্ত তরঙ্গ ছোটে; এই অবস্থায় অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ হয়ে সংসার, বিবাহ সবই করা যায়, সকল কর্ম্মে পাওয়া যায় ভগবানের আনন্দময় বিকাশ।"

এই অমূল্য পত্রখানির মধ্যে অরবিন্দের পণ্ডিচারী জীবনের চিন্তাধারার কিছুটা পরিচয়ও পাওয়া যায়। পত্রখানির শেষভাগে অরবিন্দ লিখিয়াছেন—"আমার এ ধারণা হয় যে **ভারতের দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয়, দারিদ্র্য নয়, অধ্যাত্মবোধের বা ধর্ম্মের অভাব নয়, কিন্তু চিন্তাশক্তির হ্রাস—জ্ঞানের জন্মভূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার।**......য়ুরোপ দেখ, দেখবে দু'টী জিনিস—অনন্ত বিশাল চিন্তার সমুদ্র, আর প্রকাণ্ড বেগবতী অথচ সুশৃঙ্খল শক্তির খেলা। 'য়ুরোপের সমস্ত শক্তি সেইখানে; সেই শক্তির বলে জগৎকে সে গ্রাস করতে পারছে; আমাদের পুরাকালের তপস্বীদের মত, যাদের প্রভাবে বিশ্বের দেবতারাও ভীত, সন্দিগ্ধ, বশীভূত। লোকে বলে য়ুরোপ ধ্বংসের মুখে ধাবিত। আমি তা' মনে করি না। এই যে বিপ্লব, এই যে ওলটপালট—এ সব নবসৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা।

"তারপর ভারত দেখ। কয়েকজন solitary giant (বড়লোক

ছাড়া সর্ব্বত্রই…সোজা মানুষ, (অর্থাৎ) average man, যে চিন্তা করতে চায় না, পারে না, যার বিন্দুমাত্র শক্তি নেই, আছে কেবল ক্ষণিক উত্তেজনা। ভারতে চায় সরল চিন্তা, সোজা কথা; য়ুরোপে চায় গভীর চিন্তা, গভীর কথা। সামান্য কুলী মজুরও চিন্তা করে, সব জানতে চায়, মোটামুটি জেনেও সন্তুষ্ট নয়, তলিয়ে দেখতে চায়।…… আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিশাল চিন্তার সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে বিশাল জ্ঞান পেয়েছিলেন; বিশাল সভ্যতা দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।…… চিন্তার বেগ কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শক্তির বেগও কমে গেল। আমাদের সভ্যতা হয়ে গেছে অচলায়তন, ধর্ম্ম বাহ্যের গোঁড়ামি, অধ্যাত্মভাব একটী ক্ষীণ আলোক বা ক্ষণিক উন্মাদনার তরঙ্গ। এই অবস্থা যত দিন থাকবে, ততদিন ভারতের স্থায়ী পুনরুত্থান অসম্ভব।

"বাঙ্গলা দেশেই এই দুর্ব্বলতার চরম অবস্থা। বাঙ্গালীর ক্ষিপ্রবুদ্ধি আছে, ভাবের capacity আছে, intuition আছে; এই সব গুণে সে ভারতে শ্রেষ্ঠ। এই সকল গুণই চাই, কিন্তু এগুলিই যথেষ্ট নহে। এর সঙ্গে যদি চিন্তার গভীরতা, ধীর শক্তি, বীরোচিত সাহস, দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্ষমতা ও আনন্দ জোটে, তা' হ'লে বাঙ্গালী ভারতের কেন, জগতের নেতা হয়ে যাবে। কিন্তু বাঙ্গালী তা' চায় না; সহজে সারতে চায়; চিন্তা না ক'রে জ্ঞান, পরিশ্রম না ক'রে ফল, সহজ সাধনা ক'রে সিদ্ধি। তার সম্বল আছে ভাবের উত্তেজনা, কিন্তু জ্ঞানশূন্য ভাবাতিশয্যই হচ্ছে এই রোগের লক্ষণ। তারপর অবসাদ, তমোভাব।…………

শক্তি সাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। প্রেমের সাধনা করি, কিন্তু যেখানে জ্ঞান ও শক্তি নাই (সেখানে) প্রেমও

থাকে না; সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা আসে; ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ মনে, প্রাণে, হৃদয়ে প্রেমের স্থান নাই।........

"আর্য্যজাতির উদার বীরযুগে এত হাঁক-ডাক, নাচানাচি ছিল না, কিন্তু **যে চেষ্টা আরম্ভ করত তা'রা তা' বহু শতাব্দী ধ'রে স্থায়ী থাকত।** বাঙ্গালীর চেষ্টা দু'দিন স্থায়ী থাকে।......

..."**লাখ লাখ শিষ্য চাই না, একশ' ক্ষুদ্র আমিত্যশূন্য পুরো মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপে যদি পাই, তাই যথেষ্ট।** প্রচলিত গুরুগিরির উপর আমার আস্থা নাই, আমি গুরু হতে চাই না। আমার স্পর্শে জেগে হোক, অপরের স্পর্শে জেগে হোক, কেহ যদি ভিতর থেকে নিজের সুপ্ত দেবত্ব প্রকাশ করে ভগবৎ জীবন লাভ করে, এটাই আমি চাই। এইরূপ মানুষই এই দেশকে তুলবে।"

* * *

সর্ব্বশেষে অরবিন্দ লিখিয়াছেন—"দেশেও এখন যাচ্ছি না, দেশ তৈয়ারী হয় নি ব'লে নয়, আমি তৈয়ারী হই নি ব'লে। অপক্ক অপক্কের মধ্যে গিয়ে কি কাজ করতে পারে?"

১০

চিন্তাধারা

পণ্ডিচারী জীবনের ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে।

রাজনীতিক্ষেত্রে অরবিন্দ স্থানে স্থানে যে সকল সারগর্ভ ইংরেজী বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি 'Speeches of Aurobindo Ghose' (অরবিন্দ ঘোষের বক্তৃতাবলী) নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সেই সকল বক্তৃতার মধ্যে এমন অনেক অমূল্য চিন্তাধারা রহিয়াছে যাহা সকল ভারতবাসীরই প্রণিধান যোগ্য। এই অধ্যায়ে তাহার অংশ বিশেষের মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল।

বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্ হইতে বিদায়কালীন সভায় ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া তিনি একটি উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি বলেন—"জাতির ইতিহাসে এক এক সময় আসে যখন ভগবান জাতির উপর একটি কর্ম্ম, একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির ভার ন্যস্ত করেন, তখন শত মহৎ হইলেও, অন্য যাহা-কিছু সবই বিসর্জ্জন দিতে হয়। আমাদের মাতৃভূমির এখন সেই সময় আসিয়াছে, এখন তাঁহার সেবা অপেক্ষা অন্য কিছুই আমাদের নিকট প্রিয়তর হইতে পারে না, এখন আমাদের সমগ্র শক্তি তাহাতেই নিয়োজিত করিতে হইবে। অধ্যয়ন করিতে হইলে, দেশের জন্য অধ্যয়ন কর; তাঁহার সেবার উপযুক্ত করিয়া নিজেদের শরীর, মন ও আত্মাকে তৈয়ারী করিয়া লও। দেশেরই

জন্য জীবনধারণ করিতেছ, এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া জীবিকা অর্জ্জন কর। বিদেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া যাহাতে স্বদেশের কাজে লাগাইতে পার, তাহারই জন্য বিদেশে যাও। দেশের উন্নতির জন্য কর্ম্ম কর। দেশের আনন্দবৃদ্ধির জন্য দুঃখ-কষ্ট সহ্য কর।—এই একটি মাত্র উপদেশের মধ্যেই সকল কথা নিহিত রহিয়াছে।"

১৯০৮ সালে বোম্বাই সহরে অরবিন্দ 'The Present Situation' (বর্ত্তমান অবস্থা) সম্বন্ধে একটি মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি বাংলাদেশে তখন যে দেশপ্রেমের নূতন বন্যা আসিয়াছিল, তাহারই বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, এই দেশপ্রেম কেবল ইউরোপীয় রাজনীতির অন্ধ অনুকরণ মাত্র নহে, ইহার পশ্চাতে ভগবানের হস্ত রহিয়াছে। তিনি আরও বলেন—"জাতীয়তা একটি রাজনৈতিক কর্ম্মধারা মাত্র নহে। জাতীয়তা ধর্ম্ম বিশেষ, ইহা ভগবানেরই দান—এই জাতীয়তার আদর্শে আপনাদিগকে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। যিনি কেবল কল্পনায়ই স্বদেশপ্রেমিক—যাঁহার স্বদেশপ্রেমের কার্য্যতঃ কোনরূপ বিকাশ নাই —তিনি স্বদেশপ্রেমিক পদবাচ্য নহেন; তিনি যেন মনে না করেন, যাহারা নিজেদের দেশহিতৈষী বলিয়া ঘোষণা করিয়া বেড়ায় না, তাহাদের অপেক্ষা তিনি অধিকতর দেশহিতৈষী বা কোন প্রকারে শ্রেষ্ঠ। জাতীয়তাবাদী হইতে হইলে, জাতীয়তারূপ ধর্ম্ম স্বীকার বা গ্রহণ করিলে, আপনাদিগকে তাহা ধর্ম্মভাবের সহিতই করিতে হইবে। আপনারা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, আপনারা ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ।"

তৎপরে তিনি বলেন—"বাংলাদেশেও এক নূতন, স্বর্গীয় ও সাত্ত্বিক ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং সেই ধর্ম্মকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টারও ত্রুটি হইতেছে না। কি শক্তি বলে বাংলার

আমরা বাঁচিয়া আছি?—জাতীয়তা নির্ম্মূল হয় নাই এবং হইবেও না। ইহা ভগবানের শক্তিতে সঞ্জীবিত থাকিবে এবং শত চেষ্টা সত্বেও ইহাকে কেহ বিনষ্ট করিতে পারিবে না। জাতীয়তা অবিনশ্বর, জাতীয়তার ধ্বংস নাই, কারণ ইহা পার্থিব জিনিষ নয়—স্বয়ং ভগবান বাংলায় কর্ম্ম করিতেছেন। ভগবানকে বিনাশ করা যায় না, ভগবানকে কারাগারে আবদ্ধ করা যায় না।"

স্বরাজ-লাভের যোগ্যতা

ভারতবর্ষ স্বরাজ-লাভের উপযুক্ত নহে, এই কথা শুধু বিদেশীয়রা নহে, আমাদের দেশেরও একদল লোক মনে মনে বিশ্বাস করেন। এই অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বহুদিন হইতেই অনেক যুক্তিতর্ক উত্থাপন করা হইয়াছে, কিন্তু এই আত্ম-অবিশ্বাস আজ পর্য্যন্তও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। জাতিবিদ্বেষ, ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিবাদ-বিসম্বাদ প্রভৃতি আমাদের অজ্ঞানতাসুলভ সঙ্কীর্ণতাগুলি বিদেশের চক্ষেই যে কেবল আমাদিগকে হীন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা নহে, আমরাও নিজেদের সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারি না।

জলে না নামিয়া সাঁতার শিক্ষা করা যেমন অসম্ভব, দেশ-শাসনের কর্ত্তৃত্ব স্বয়ং গ্রহণ করিবার সুযোগ না পাইলে তাহার জন্য ক্রমশঃ উপযুক্ত হওয়ার শিক্ষালাভ করাও সেইরূপ অসম্ভব। এই স্বতঃসিদ্ধ কথাটি আজকালকার দেশবাসীর নিকট যতটা সহজ বলিয়া মনে হয়, অরবিন্দের সময়ে দেশবাসীর পক্ষে ইহা ততটা সহজ ছিল না। আমরা অধম, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, জ্ঞানহীন, অন্যের কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত না হইলে আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ হইবে, এই বিশ্বাসই তখন

অধিকাংশ লোক মনে মনে পোষণ করিতেন। ইহার বিরুদ্ধে অরবিন্দ চিরদিনই বিদ্রোহ করিয়াছেন। ২৪-পরগণা জিলার বারুইপুর নামক পল্লীতে একটি স্বদেশী সভায় তিনি এই আত্ম-অবিশ্বাস ও মোহের বিরুদ্ধে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে উপনিষদের একটি সুন্দর কাহিনী বর্ণনা করেন। কাহিনীটি এইরূপ—বহু স্বাদু ও তিক্ত-ফল-সমন্বিত একটি বৃহৎ বৃক্ষে দুইটি পক্ষী বাস করিত। একটি থাকিত বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখায়,—অন্যটি থাকিত সর্ব্বনিম্ন শাখায়। নীচের পক্ষীটি উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া উপরকার পক্ষীটির অবয়বের সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধচিত্তে মনে করিত যে, ঐ পক্ষীটি তাহারই পরম আপনজন। কিন্তু সময়ে সময়ে বৃক্ষের সুমিষ্ট ফলের আস্বাদনে সে এতই বিভোর হইয়া যাইত যে, তখন আর তাহার অন্য পক্ষীটির কথা স্মরণ থাকিত না। কিন্তু পরে তিক্ত ফল আস্বাদন করিবার কালে তাহার সে মোহ দূর হইত এবং পুনরায় সে তাহার সুন্দর সাথীটির দিকে দৃষ্টিপাত করিত।

এই কাহিনীটি দ্বারা উপনিষদে আত্মা ও পরমাত্মার মধুর সম্বন্ধের কথা বুঝাইয়া বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মা আত্মারই শ্রেষ্ঠ স্বরূপ—আত্মা সংসারের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ক্ষণে ক্ষণে পরমাত্মাকে ভুলিয়া যায়, কিন্তু দুঃখ-কষ্ট আসিয়া পুনরায় সেই 'মায়া'কে অপসারিত করে। ব্যক্তিগত মুক্তির ক্ষেত্রের ন্যায় এই কাহিনীটি জাতীয় মুক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে মুগ্ধ হইয়া নিজেদের অত্যন্ত হীন মনে করিতাম—অপরের কর্ত্তৃত্বাধীনে মহাসুখেই যেন দিন কাটাইতেছিলাম, আমাদের জাতির পরম স্বরূপটি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। মনে করিতাম, অপর কেহ না থাকিলে আমরা মারামারি, কাটাকাটি করিয়াই

মরিব। এমন সময় আসিল, বঙ্গভঙ্গ ও তদনুগামী দুঃখ-কষ্টের বন্যা। ঐ দুঃখ-কষ্টই আমাদের সচেতন করিয়াছে, আমরা এখন নিজেদের জাতীয় সত্তার প্রতি অনেকটা আস্থাবান ও শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছি। আমরাও ক্ষুদ্র নই. দুঃখ-কষ্ট আমাদের ইহাই শিখাইয়াছে।

জাতির মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস ও আত্মাদর জাগাইয়া তুলিতে অরবিন্দ তাঁহার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। শিক্ষায়, দীক্ষায়, বাণিজ্যে, শিল্পে—সর্ব্বত্রই এই স্বাতন্ত্র্যবোধ উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বারম্বার বলিয়াছেন, "আমরা যখন বলিব যে, ভগবান আমাদিগকে স্বাধীন করিবেন, তখন পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা আমাদিগকে নীচে ফেলিয়া রাখিতে পারিবে। পথে বাধা দেখিয়া ভীত হইও না। যত বড় শক্তিই তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াক না কেন, ভগবানের নির্দ্দেশে সকলই তুচ্ছ হইয়া যাইবে। দাসত্ব ও মায়ায় আবদ্ধ হইও না। কোন জিনিষই অসম্ভব বলিয়া মনে করিও না, চতুর্দ্দিকেই অলৌকিক ঘটনা ঘটিতেছে। নিজের উপর বিশ্বাস রাখিতে পারিলে পৃথিবীতে ভয় করিবার কিছুই থাকে না। সত্যনিষ্ঠা, ভালবাসা ও বিশ্বাসের দ্বারা সব-কিছুই জয় করা সম্ভব। এই একমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা অলৌকিক কাজ করা যায়। দুর্ব্বল না হইয়া, সোজা হইয়া দাঁড়াও।"

এই প্রকার অভয় বাণী দ্বারা দেশের লোকের চিত্তধারা তিনি পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন। 'দাস মনোভাব' বা slave mentality দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হয় না। তাহা দ্বারা ক্ষণিকের সুখ-সুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু একটা বিশালজাতি গড়িয়া উঠে

না।—দেশবাসীর মোহ-পাশ ছিন্ন করিবার জন্য অরবিন্দের তখনকার এই প্রয়াসকে অনেকে চরমপন্থা বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু দেশের মুক্তির পক্ষে উহাই একমাত্র পন্থা:। অন্য উপায়গুলি ক্ষণিকের অবলম্বন হইতে পারে, কিন্তু সেগুলি পন্থা নহে, মায়া বা মোহ মাত্র।

পল্লী-সংস্কার

আজকাল অনেকেই বলিয়া থাকেন, গ্রামের উন্নতি ব্যতীত দেশের উন্নতির আশা কল্পনামাত্র। "Back to the village" কথাটি এখন প্রায় সকলের মুখেই শোনা যায়। প্রকৃতপক্ষেও গ্রামই ভারতের প্রাণ-স্বরূপ। ভারতের শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতার প্রধান উৎসস্থল ভারতের পল্লী। কৃষিপ্রধান দেশে গ্রামের অবনতি হইলে সমস্ত দেশেরই দ্রুত অবনতি ঘটিয়া থাকে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মোহে আমাদের সমগ্র দৃষ্টি গ্রাম হইতে সহরের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল। আমরা সহরের চাকচিক্য, আড়ম্বর ও সুখ-সুবিধা দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম যে, আমরা মহাদুঃখ ও অজ্ঞান হইতে উদ্ধার পাইয়া সুখ ও সভ্যতার আলোকে উপনীত হইলাম। এদিকে পল্লীর পুষ্করিণী শুকাইয়া আসিল, শিক্ষার টোল নীরব হইল, কৃষকের গোলা ক্রমশঃ শস্যহীন হইয়া উঠিল, ম্যালেরিয়া গ্রামকে জন-শূন্য করিয়া ফেলিল।

এখন আমরা বুঝিয়াছি যে, গ্রামের মৃত্যুতেই ভারতের মৃত্যু, সুতরাং ভারতকে শিক্ষা-দীক্ষায়, ধর্ম্মে-কর্ম্মে পুনরায় উন্নত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে পল্লীগুলির উন্নতিসাধন প্রয়োজন। অবশ্য এই সত্য প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া ইহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টাও যে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাও

বলিতে পারা যায় না। তবে, এ-কথাও সত্য যে, নানাস্থানে ইহার জন্য কিছু কিছু প্রয়াস আরম্ভ হইয়াছে।

ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের কিছুকাল পর হইতেই দেশের একদল কৃতবিদ্য সুসন্তান দেশের উন্নতির জন্য সভা-সমিতি স্থাপন করিয়া দেশে জনমত গঠন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহাদের দৃষ্টি গ্রামের প্রতি নিবদ্ধ হয় নাই। সভা-সমিতি, বক্তৃতা, আবেদন-নিবেদন করিয়াই দিন চলিতেছিল।

এমন সময় বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই আন্দোলনের মধ্যে দেশবাসীর দৃষ্টি প্রথম বার গ্রামের উপর পতিত হইল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তখন সুললিত ভাষায় ও ছন্দে বঙ্গবাসীকে বাংলার গ্রামে ফিরিয়া আসিতে আহ্বান করিলেন। এ-সম্বন্ধে তাঁহার বিস্তারিত মতামত তাঁহার তদানীন্তন বক্তৃতাগুলি পাঠে জানিতে পারা যায়। তাঁহার 'স্বদেশী সমাজ' নামক বক্তৃতাটি তখন হয়ত অনেকের কবি-কল্পনা বলিয়া মনে হইয়াছিল, কিন্তু এখন তাহা বাস্তবে পরিণত করিবার আয়োজন হইতেছে।

দেশনায়ক অরবিন্দও এই পল্লীসংস্কারের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিশোরগঞ্জের এক সভায় তিনি 'পল্লীসমিতি' সম্বন্ধে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আজকালকার প্রত্যেক পল্লীসেবকেরই প্রণিধানযোগ্য।

তিনি মোটামুটি এইরূপ বলিয়াছিলেন—"ভারতবর্ষে জীবন ও তাহার বিবৃদ্ধির উপায়গুলি (instruments of life and growth) পূর্ব্বে আমাদের নিজেদেরই হাতে ছিল। আমাদের গ্রামগুলি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ছিল। জমিদারগণ ছিলেন গ্রামগুলি ও কেন্দ্রীয় শাসনচক্রের

(central governing body) যোগসূত্রের উপায় এবং কেন্দ্রীয় শাসনচক্রে জাতির প্রাণের সাড়া অনুভূত হইত। এই সকল উপায়ই এখন নষ্ট বা নষ্টপ্রায় হইয়াছে। জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে আমাদের শক্তির কেন্দ্রগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। আমাদের বিবৃদ্ধির জন্য ইহাদের একান্ত আবশ্যক। ইহাদের সর্ব্বপ্রধান হইতেছে আমাদের আত্মনির্ভরশীল ও স্বতন্ত্র গ্রামগুলি। ইহাদেরই উপর আর সমস্ত নির্ভর করে। ভারতের জীবনযাত্রার ভিত্তি ও ভারতের প্রাণ-শক্তির সকল রহস্য এইখানেই নিহিত রহিয়াছে। স্বরাজের প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথম আমাদিগকে গ্রামগুলির প্রতিই দৃষ্টি দিতে হইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি বিষয়েও আমাদের বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। আমাদের নূতন জাতিগঠনের দিনে গ্রাম-গুলিকে পরস্পর হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিলে চলিবে না। প্রত্যেকটি গ্রামকে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির সঙ্গে একটি যোগসূত্রে আবদ্ধ করিতে হইবে। গ্রামগুলি আবার সমগ্র জেলার সঙ্গে, জেলাগুলি প্রদেশের সঙ্গে, প্রদেশগুলি সমগ্র দেশের সঙ্গে এক উদ্দেশ্যে মিলিত থাকিবে। পল্লী জাতির অবয়বের জীবকোষ স্বরূপ। জাতির উন্নতি বিধানের জন্য এই জীবকোষগুলিকে সুস্থ ও সবল করিতে হইবে। পল্লীর উপরেই স্বরাজের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে (Swaraj begins from the village)।

"পল্লী-সমিতি একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান কেবল তর্ক-বিতর্ক বা আলোচনার ক্ষেত্র নহে, কিন্তু প্রকৃত কর্ম্ম-চেষ্টার যন্ত্রস্বরূপ। এই প্রতিষ্ঠান গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করিবে, সেখানে শিক্ষালাভ করিয়া বালকেরা দেশহিতৈষী ও আত্মনির্ভরশীল

হইতে পারিবে। পল্লীর যাবতীয় বিচার পল্লীতেই সমাধান করিতে হইবে। আত্মরক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় লোকহিতকর কার্য্য—সকল ব্যবস্থাই এই সমিতি হইতে হইবে। গ্রামগুলিকে পুনরায় আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে হইবে, পরমুখাপেক্ষী করিয়া রাখিলে চলিবে না। স্বরাজের প্রধান উপকরণ হইতেছে, আত্মনির্ভরতা ও স্বাতন্ত্র্য—এবং এই উভয় গুণের উৎকর্ষ হইতে পারে পল্লী-সমিতির দ্বারা।

"স্বরাজলাভের অন্য একটি উপায়, জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়ভাবের উদ্বোধন। এই জাগরণের প্রধান অন্তরায় হইতেছে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের মধ্যে একটি দুর্গম ব্যবধান। পল্লী-সমিতি এই ব্যবধান দূর করিতে পারে। গ্রামেই শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মিলিত হইতে পারে, এবং এই মিলনের ফলে ক্রমে ক্রমে অশিক্ষিতরাও স্বরাজের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে। তাহারা পল্লী-স্বরাজ প্রথমে বুঝিয়া পরে ক্রমে ক্রমে সমগ্র দেশের স্বরাজের অর্থ বুঝিবে।

"স্বরাজলাভের জন্য অন্য একটি প্রয়োজনীয় গুণ হইতেছে—একতা বা দেশবাসীর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি বা দরদ। নানা কারণে সে সহানুভূতি এখন আর দেশে নাই। হিন্দু-মুসলমানে, প্রজায় জমিদারে আর পূর্ব্বের ন্যায় সম্প্রীতি নাই; একে অন্যের অভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করে না। এই সহানুভূতির জন্যও পল্লী-সমিতির প্রয়োজন। পল্লী-সমিতি দেখিবে যাহাতে সকলে অন্যের অভাবে দুঃখ অনুভব করে।"

এই প্রকারে অরবিন্দ নানাভাবে দেশের পল্লী-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, একটি স্থানেও যদি এই

আদর্শ লইয়া কার্য্য করা হয়, তাহা হইলেই সে আদর্শ সুদূর ভবিষ্যতে একদিন ব্যাপকভাবে সফল হইবে। অরবিন্দ দেখাইয়াছেন যে, কেবল কতকগুলি বক্তৃতা করিয়া পরকে গালি দিলেই আমাদের মুক্তিলাভ হইবে না। সর্ব্ববিষয়ে আমাদের দাস-মনোভাব বা পরমুখাপেক্ষিতা দূর করিতে হইবে। শিক্ষায়, দীক্ষায়, বাণিজ্যে, শিল্পে, আত্মরক্ষায়, সমাজে, বিচারে, আচারে—সকল ক্ষেত্রেই আমূল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া আমাদিগকে আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে।

দেশের ক্ষুদ্র যে-কোন স্থানে সামান্য ভাবেও যদি এই আত্ম-কর্ত্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলেই সফলতার দিন আসিবে। সুতরাং পল্লী-সংস্কার জাতিগঠনের প্রধান উপায়। অরবিন্দ ঐ বক্তৃতার উপসংহারে যথার্থ কথাই বলিয়াছেন—"একটি জিলায় এই সমস্যার সমাধান হইলেই সুদূর ভবিষ্যতে সমগ্র বাংলায় ও ভারতবর্ষে স্বরাজ আসিবে।"

পন্থা-নির্দ্দেশ

মুক্তির পন্থা কি? কোন্ পথে গেলে দেশবাসীর সাধনা সিদ্ধ হইবে? এই পন্থা লইয়া তর্ক-বিতর্কের অন্ত নাই। প্রত্যেকেই বলেন, 'আমার নির্দ্দিষ্ট পন্থা ব্যতীত অন্য পন্থা নাই।' আজ যাহ স্থির পন্থা বলিয়া স্বীকৃত হইল, কাল তরুণের দল আসিয়া তাহার সকল ব্যবস্থা ওলট-পালট করিয়া নূতনের জয়ধ্বজা উড়াইল, আবার কিয়ৎকাল পরে তাহাই প্রাচীন পন্থা বলিয়া অবজ্ঞাত হইল ইহাই সংসারের নিয়ম।

ভারতের মুক্তি কোন্ পথে আসিবে? একদল বলিবেন, 'ভারত

কি পৃথিবীর বাহিরে? পৃথিবীর ইতিহাস পড়, সকল দেশে যে পন্থায় মুক্তি আসিয়াছে, ভারতেও সেই পথে আসিবে।'

কিন্তু ভারতবর্ষের মনীষিগণ তাহার মুক্তির অন্য পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, অন্য দেশে অনুসৃত পন্থা বাহিরের পন্থা, ভারতবর্ষ উহার অনুকরণ করিবে না। ঐ গতানুগতিকের পন্থা ত্যাগ করিবার জন্যই ভারতবর্ষের মুক্তির আশু প্রয়োজন। বুদ্ধ, চৈতন্যের পবিত্রভূমিতে হিংসায় উদ্ধার মিলিবে না—শক্তিমান প্রেমের দ্বারাই অভীষ্ট লাভ হইবে।

বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠ জননায়কগণও এই অহিংসার পন্থাকেই ভারতের একমাত্র পন্থা বলিয়া মনে করেন—এবং এই পন্থায়ই আমাদের হতভাগ্য দেশের মুক্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হইতেছে। পৃথিবীর রণ-ক্লান্ত নরনারীরও বোধ হয় আজ ভারতবর্ষের অহিংসার বাণী গ্রহণ করিবার যথার্থ সময় আসিয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে 'অহিংসা' বাক্যটি ততদূর উচ্চারিত না হইলেও, এবং ক্ষণে-ক্ষণে প্রথম জাগরণের আবেগে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিলেও দেশের নায়কগণ দেশকে অহিংসার পথে চালিত করিতেই প্রয়াস পাইতেন। তামসিক অবসাদ হইতে সন্থোত্থিত হইয়া দেশের যুবকগণ মধ্যে মধ্যে হিংসার-পথে গিয়াছেন বটে, কিন্তু অরবিন্দ প্রমুখ নেতাগণ বারম্বার অহিংসার পন্থাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সরকার তখন দেশের এই নূতন জাগরণ সহ্য করিতে না পারিয়া, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, অরবিন্দ প্রমুখ পূত-চরিত্র জননায়কদের বিপ্লববাদিগণের নেতা আখ্যা দিয়াছেন এবং লোকচক্ষে তাঁহাদের হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টারও ত্রুটি হয় নাই।

১৯০৯ সালে জুলাইর মাসে জনরব উঠিল যে, অরবিন্দকে সরকার

পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়া নির্ব্বাসিত করিবেন। তখন নির্ব্বাসনের যুগ। অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, লালা লাজপত রায়, লোকমান্য তিলক প্রভৃতি চরম-পন্থী সকল নেতাই নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। তাঁহার নির্ব্বাসনের গুজব শুনিয়া অরবিন্দ দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একখানি open letter বা 'খোলা চিঠি' প্রকাশিত করেন। এই পত্রখানি প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের প্রণিধানযোগ্য। পত্রখানিতে অরবিন্দ পন্থা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশের মর্ম্মার্থ এইস্থানে প্রদত্ত হইল।—

আমাদের স্বরাজের আদর্শের মধ্যে অন্য কোন জাতির প্রতি বা আমাদের দেশের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের প্রতি কোন বিদ্বেষের ভাব নাই। আমাদের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র স্বেচ্ছাচারমূলক, আমরা ইহাকে democratic বা গণতন্ত্র করিতে চাহিতেছি। বিদেশীয় শাসনতন্ত্রের স্থলে আমরা ভারতীয় শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাই। আমাদের এই ইচ্ছা থাকিলেই ইহার মধ্যে বিদ্বেষ বা হিংসার ভাব থাকিবে, এই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমাদের দেশপ্রেমের আদর্শের ভিত্তি প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং ইহা জাতির মিলনেরও উর্দ্ধে সমগ্র মানবজাতির মিলনের কল্পনা পোষণ করে। সে মিলন সমকক্ষ, স্বাধীন মানবের মিলন, প্রভু-ভৃত্য বা খাদ্য-খাদকের মিলন নহে। আমরা আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে চাই, কারণ তাহা দ্বারাই সমগ্র মানবের মিলন সম্ভবপর হইবে—সেই মিলন বিভিন্ন জাতির বহির্গত বিশেষত্বগুলি লোপ করিয়া হইবে না, পরন্তু অন্তর্গত মিলনের বিঘ্নস্বরূপ ঘৃণা, হিংসা এবং ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত করিয়া সম্ভব হইবে। যাহারা ভ্রমবশতঃ আমাদের অধিকার অস্বীকার করে, তাহাদের বিরুদ্ধে উদ্যম করিলেই যে তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতে হইবে এ কথা সত্য নহে।......

সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিতে হইবে। কাহাকেও কিছুমাত্র খাতির না করিয়া সাহসের সহিত সত্যকথা বলিতে হইবে। উন্নতি-পথের বিঘ্ন দূর করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য আইন-সঙ্গত ও নৈতিকশক্তি-সম্ভূত সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

আত্মনির্ভরশীলতা ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive resistance)—এই দুইটিই আমাদের পন্থা। সম্মিলিতভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে আমাদের শিল্প, বাণিজ্য, ব্যক্তিগত বিরোধের বিচার, উৎসবের দিনে শৃঙ্খলা ও শান্তি-রক্ষা, দেশের স্বাস্থ্য-রক্ষা, দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যদান, শারীরিক মানসিক ও আর্থিক সকল প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা, দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্বন্ধে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের সহিত বিরোধ না করিয়া ব্যবস্থা প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়গুলি জাতীয়তাবাদীদের কর্ম্ম-পদ্ধতি।

যে শাসন-পদ্ধতির মধ্যে আমাদের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না, তাহার সহিত আমাদিগের সহযোগিতাও থাকিবে না। সকল প্রকার দেশীয় সামগ্রীর সমাদর করিতে হইবে এবং তাহার উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত আপাত-অসুবিধাগুলি সহ্য করিতে হইবে। এই ভাবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের আদর্শের ভিত্তি স্থাপিত হইলে, পরে প্রয়োজন মত ইহার পদ্ধতির পরিবর্ত্তন, সংস্কার ও উন্নতি করা যাইবে।—

আত্মনির্ভরশীলতা ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের (passive resistance) পন্থাই অরবিন্দ বারম্বার প্রচার করিয়াছেন। ভারতবর্ষকে হিংসার পথে যাত্রা করিতে তিনি কখনই প্রবুদ্ধ করেন নাই। তবে স্বাতন্ত্র্য-লাভের জন্য দেশবাসীকে তিনি মুক্তকণ্ঠে সকল প্রকার সুখ, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত, বিসর্জ্জন দিতে বলিয়াছেন।

১১

কর্ম্মযোগী অরবিন্দ

অনেকের মুখেই এখন শোনা যায় যে, আজকাল বাংলাদেশে উপযুক্ত নেতা নাই। এমন নেতা চাই, যিনি নির্ভয়ে নিঃস্বার্থভাবে দেশসেবাকে ব্রতস্বরূপ মনে করিয়া দেশবাসীকে চালিত করিতে পারেন। যিনি লোকনিন্দায় ভয় পান, লোকদের মনস্তুষ্টির জন্য তাহাদের অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে সাহস করেন না, তিনি প্রকৃত নেতা হইতে পারেন না। চারিদিকে বাদ-বিসম্বাদ, উত্তেজনা ও কলকোলাহল, তাহার মধ্যে যে ব্যক্তি সুদূর লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দেশবাসীকে পরিচালিত করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ নেতা। মনে রাখিতে হইবে যে, নেতা দেশকে চালিত করিবেন, দেশ নেতাকে চালিত করিবে না। দৃঢ়সঙ্কল্প, অবিচলিতচিত্ত, ইন্দ্রিয়জয়ী বীরপুরুষই প্রকৃত নেতা হইবার অধিকারী—কাপুরুষের নেতৃত্ব সম্পদে চলিতে পারে, বিপদে বা বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যে চলে না।

বাংলাদেশের সৌভাগ্য যে, বাংলাদেশ অরবিন্দের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী নেতাকে প্রথম জাগরণের মুহূর্ত্তে লাভ করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে অরবিন্দের রাজনীতি ধর্ম্মেরই রূপান্তরমাত্র ছিল। অরবিন্দের কর্ম্মবহুল জীবনকে বর্ত্তমান যোগস্থ জীবন হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিলে সুবিচার করা হইবে না। তাঁহার কর্ম্মজীবনেও বর্ত্তমান ধর্ম্মজীবনের সূচনা ও লক্ষণ প্রকাশ পাইত। বরোদায় অবস্থানকালেই লেলে নামক একজন সাধুর নিকট হইতে তিনি যোগের পন্থা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ লাভ করেন।

তারপর, বাংলায় আগমন করিয়া তাঁহার রাজনৈতিক জীবনেও তিনি ধর্ম্মজীবন হইতে বিচ্যুত হ'ন নাই। গীতায় প্রচারিত কর্ম্মযোগের সাধন-পথে তিনি তখন অগ্রসর হইতেছিলেন। কর্ম্মের মধ্যে সেই ধর্ম্মজীবনের স্পষ্ট প্রকাশ না হইলেও কর্ম্মবিরতির সঙ্গে সঙ্গে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। কারাবাসে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের পরিচয় দেশ ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার সুযোগ লাভ করিল। এই সময়ে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

ঐ-যুগের অন্যতম নেতা উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অনুপম 'নির্ব্বাসিতের আত্মকথায়' অরবিন্দের কারাবাসকালীন ধর্ম্মজীবনের যে স্বল্প পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেই প্রমাণ হয় যে, অরবিন্দের রাজনীতি ধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র ছিল না। তিনি আলিপুর জেলের কথার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "অরবিন্দবাবুর জন্য একটা কোণ নির্দ্দিষ্ট ছিল। সমস্ত প্রাতঃকাল তিনি সেইখানে আপনার সাধন-ভজনের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। ছেলেরা চীৎকার করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিলেও কোন কথাই কহিতেন না। অপরাহ্নে দুই-তিন ঘণ্টা পাইচারী করিতে করিতে উপনিষদ বা অন্য কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতেন।"

অন্য এক স্থানে উপেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এই হট্টগোল ও দলাদলির মধ্যে একেবারে নিশ্চল স্থাণুর মত বসিয়া থাকিতেন—অরবিন্দবাবু। কোন কথাতেই হাঁ, না, কিছুই বলিতেন না। জেলের প্রহরীদের নিকট হইতে তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাইতাম। ……মাথায় মাখিবার জন্য আমরা কেহই তেল পাইতাম না; কিন্তু দেখিতাম যে, অরবিন্দবাবুর চুল যেন তেলে চক্‌চক্ করিতেছে। একদিন সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কি স্নান করিবার সময় মাথায় তেল

দেন ?' অরবিন্দবাবুর উত্তর শুনিয়া চমকিয়া গেলাম। তিনি বলিলেন—'আমি ত স্নান করি না।' জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনার চুল এত চক্-চক্ করে কি করিয়া ?' অরবিন্দবাবু বলিলেন—'সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরের কতকগুলি পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। আমার শরীর হইতে চুল বসা (fat) টানিয়া লয়।'......ডকের মধ্যে একদিন বসিয়া থাকিতে থাকিতে লক্ষ্য করিলাম যে, অরবিন্দবাবুর চক্ষু যেন কাঁচের চক্ষুর মত স্থির হইয়া আছে; তাহাতে পলক বা চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নাই।...... দুই-একজনকে তাহা দেখাইলাম; কিন্তু কেহই অরবিন্দকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। শেষে শচীন আস্তে আস্তে তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি সাধন ক'রে কি পেলেন ?' অরবিন্দ সেই ছোট ছেলেটির কাঁধের উপর হাত রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন—'যা খুঁজ্ছিলাম, তা পেয়েছি।' "

কারাবাসকালে অরবিন্দের ধর্ম্ম-চর্চ্চা করিবার সুযোগ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম ধর্ম্মসাধনার অঙ্গ ছিল। রাজনীতির আবিলতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই—তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মুক্তি চাহিয়াছিলেন, তাহার আত্মার বাণী প্রচার করিবার জন্য। গীতার 'মা ফলেষু কদাচন' ও আত্মার অমরত্ব তাঁহার প্রতিদিনকার কর্ম্ম-কোলাহল-ক্ষুব্ধ জীবনের মধ্যেও উপলব্ধি করিতে তিনি চেষ্টিত ছিলেন।

তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও সেবার দ্বারাই জীবনকে যথার্থ ভোগ করা যায় এবং তাহা দ্বারাই দেশকে উন্নত করা সম্ভব হইবে। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা তামসিক। সাত্ত্বিকতার পূর্ণ স্বাদ লাভ করিলে মানুষের যে শুদ্ধ অবস্থা লাভ হয়, ভারতবর্ষ সে-অবস্থা হারাইয়া

তামাসক অবসাদে মগ্ন হইয়াছে। যে ইউরোপকে আমরা বস্তুতান্ত্রিক বলিয়া ঘৃণা করি, সেই ইউরোপ আজ প্রকৃতপক্ষে আত্মার সাধনার পথেই অগ্রসর হইতেছে। আর উপনিষদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ (তাহার) প্রাচীন সম্পদের কথা ভুলিয়া জ্ঞান ও শক্তিহীন অবস্থায় আজ পরপদানত।

কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্মই ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশের মূল। প্রকৃতপক্ষে এই কথার মধ্যে সত্য নাই, কারণ এই স্থলে ধর্ম্মের মূল অর্থ আমরা অন্যরূপ মনে করিতেছি। যে-ধর্ম্ম মানুষকে কেবলমাত্র প্রতিদিনকার সংসারযাত্রার বাহিরে লইয়া যায় না, যে-ধর্ম্ম মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে, যে-ধর্ম্ম প্রাণহীন অনুষ্ঠানাদির মধ্যেই আবদ্ধ, যে-ধর্ম্ম মানুষকে নিত্য নব সত্যের সন্ধানে পরিচালিত করে না, সেই ধর্ম্মকে প্রকৃত 'ধর্ম্ম' নামে অভিহিত করা যায় না।

অরবিন্দ বুঝিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মই ভারতের সম্পদ, কিন্তু সে-ধর্ম্ম লাভ করিবার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া বনে যাইবার প্রয়োজন হয় না। 'যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়'—এই উপদেশ ভারতবর্ষের আজ বিশেষভাবে গ্রহণীয়। তামসিক অবসাদ কাটাইবার জন্য আজ প্রয়োজন হইলে ইউরোপের ন্যায় রাজসিক হইতে হইবে। আত্মাকে অবসন্ন করিলে চলিবে না—বীরের ন্যায় আপনাকে আপনি উদ্ধার করিতে হইবে। ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া সংসারের সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে হইবে। অরবিন্দের রাজনীতি এই 'কর্ম্মযোগের'ই প্রতিরূপ। তিনি বারম্বার এই 'কর্ম্মযোগের' কথাই দেশবাসীকে শুনাইয়াছেন।

'কর্ম্মযোগীর আদর্শ' সম্বন্ধে অরবিন্দ বলিয়াছেন, "এক ভারতবাসীই সব বিশ্বাস করিতে পারে, সব দুঃসাহস করিতে পারে, সব বলি দিয়া

দিতে পারে। সুতরাং সকলের আগে হও ভারতবাসী। তোমার পিতৃপুরুষের সম্পদ্ উদ্ধার কর। উদ্ধার কর আর্য্যের চিন্তা, আর্য্যের সাধনা, আর্য্যের স্বভাব, আর্য্যের জীবন-ধারা। উদ্ধার কর বেদান্ত, গীতা, যোগদীক্ষা। এ-সকল শুধু মস্তিষ্ক দিয়া, ভাবাবেগ দিয়া ফিরিয়া পাইলে চলিবে না, জাগ্রত জীবনে উহাদিগকে ফলাইয়া ধরিতে হইবে। জীবন-ক্ষেত্রে ঐ-সকল বস্তু মূর্ত্তিমান করিয়া তোল, তোমরা মহান্, শক্তিমান্, বীর, অজেয়, নির্ভীক হইয়া দাঁড়াইবে। জীবন বা মৃত্যু তোমাদিগকে কোন শঙ্কাই আনিয়া দিবে না। **দুঃসাধ্য, অসম্ভব—এ-সব কথা তোমাদের ভাষায় আর স্থান পাইবে না।** অন্তরাত্মায় যে শক্তি তাহাই অসীম, অনন্ত—বাহিরের সাম্রাজ্য যদি ফিরিয়া পাইতে চাও, তবে আগে অন্তরের স্বরাজ ফিরিয়া পাও; মায়ের আসন এইখানে, শক্তি সঞ্চার করিবেন বলিয়াই তিনি পূজার অপেক্ষায় রহিয়াছেন। তাঁহাতে তোমাদের শ্রদ্ধা অটুট রহুক, তাঁহার সেবা তোমরা কর, তোমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা সব তাঁহার ইচ্ছার মধ্যে হারাইয়া ফেল, তোমাদের ব্যক্তিগত অহঙ্কার দেশের বৃহত্তর অহঙ্কারে, তোমাদের পৃথক্ পৃথক্ স্বার্থপরতা সব জগতের স্বার্থে ডুবাইয়া দাও। নিজের ভিতরে শক্তির উৎস উদ্ধার করিয়া আন—তবে আর সব জিনিষই তোমরা অবলীলাক্রমে ফিরিয়া পাইবে—সামাজিক স্বাস্থ্য, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, বিশ্বচিন্তার নায়কত্ব, ভূমণ্ডলের

এই কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব বারম্বার প্রতিপন্ন করিয়াও অরবিন্দ সুদূর পণ্ডিচারীতে কর্ম্মকেন্দ্র হইতে কেন সরিয়া আছেন, এই প্রশ্ন কর্ম্মপটু যুবকদের মনে স্বভাবতঃই উত্থিত হইতে পারে। তাহার সদুত্তর অরবিন্দের

প্রতিভা-প্রসূত রচনা হইতেই পাওয়া যায়। 'শান্তির শক্তি' সম্বন্ধে অরবিন্দ লিখিতেছেন—"যোগীর কর্ম্ম সাধারণ মানুষের কর্ম্মের মত হইতে পারে না। তাঁহাকে দেখিয়া অনেক সময়ে মনে হইতে পারে, তিনি যেন পাপকর্ম্মে অনুমতি দিতেছেন, দুঃখ-দারিদ্র্য মোচনের সকল প্রকার চেষ্টা এড়াইয়াই চলিয়াছেন, অত্যাচারের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে যে সব বীর-হৃদয় দাঁড়াইয়াছে তাহাদের প্রতি কোন সহানুভূতি দেখাইতেছেন না; যেন তিনি পিশাচবৎ। অথবা লোকে তাঁহাকে জড় বলিয়া মনে করিতে পারে—যেন কাঠ-পাথরের মত নিথর নিশ্চল; কারণ যেখানে কাজ করা উচিত, সেখানে তিনি নির্ব্বিকার হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন, যেখানে মানুষ চাহে মুখ ফুটিয়া কথা কহা সেখানে তিনি নির্ব্বাক্, যেখানে হৃদয়ের গভীর আবেগ উত্তেজনা আশা করে সে-ক্ষেত্রে তিনি অবিচলিত। আবার যখন তিনি কোন কাজ করেন, তখন মানুষ হয়ত তাহাকে বলিবে উন্মত্ত—পাগল, অপ্রকৃতিস্থ, নির্ব্বুদ্ধি।······

···"আমাদের প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষার আদর্শ ছিল 'ধীর' হওয়া, কিন্তু তাহার অর্থ নয় তামসিক হওয়া, জড়পদার্থ হইয়া পড়া। তামসিক মানুষের নৈষ্কর্ম্ম্য চারিদিকের শক্তিরাজীর পথে বৃহৎ বাধা; **কিন্তু যোগীর নৈষ্কর্ম্ম্য, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী।** যোগীর ক্রিয়াশক্তি প্রাকৃতিক শক্তির মতই ঋজু, বিপুল, বিরাট।······ মানুষের দৃষ্টি আবদ্ধ—স্থূলের কলকলায়িত ঘটনা-স্রোতের মধ্যে—স্থূলের এই আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরের সত্য সে ধরিতে পারে না। ঠিক সেই রকমে যোগীর কর্ম্মধারাও মানুষে বুঝিতে পারে না, কারণ যোগী বাহিরে এক, ভিতরে আর। কোলাহলের কর্ম্মের শক্তি বিপুল,

সন্দেহ নাই—জেরিকো নগরীর দেউল শব্দের সংঘাতেই না ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল? কিন্তু স্তব্ধতার, নীরবতার শক্তি অসীম—কারণ, বাহিরের কর্ম্মে প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে তাহারই অন্তরে সকল বৃহৎ শক্তি আপনাকে প্রস্তুত করিয়া লইতেছে।"

১২

মহাপুরুষ-সঙ্গম

রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ

অরবিন্দের পণ্ডিচারী-প্রয়াণের বহুদিন পরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৫ সালে পণ্ডিচারীতে অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তৎপর অরবিন্দের সম্বন্ধে কবিগুরু লিখিত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধে বাংলার এক মুকুট-মণি বাংলার অন্য একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এইস্থলে উদ্ধৃত হইল।—

"অনেক দিন মনে ছিল অরবিন্দ ঘোষকে দেখ্‌বো। সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'লো। তাঁকে দেখে যা আমার মনে জেগেছে সেই কথা লিখ্‌তে ইচ্ছা করি।

খৃষ্টান শাস্ত্রে বলে বাণীই আদ্যাশক্তি। সেই শক্তিই সৃষ্টিরূপে প্রকাশ পায়। নব যুগ নব সৃষ্টি, সে কখনো পঞ্জিকার তারিখের ফর্দ্দ থেকে নেমে আসে না। যে-যুগের বাণী চিন্তায় কর্ম্মে মানুষের চিত্তকে মুক্তির নূতন পথে বাহির করে তাকেই বলি নবযুগ।

আমাদের শাস্ত্রে মন্ত্রের আদিতে ওঁ, অন্তেও ওঁ। এই শব্দটিকেই পূর্ণের বাণী বলি। এই বাণী সত্যের অয়মহং ভো,—কানের শঙ্খকুহরে অসীমের নিশ্বাস।

ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের বান ডেকে যে-যুগ অতল ভাব-সমুদ্র থেকে কলশব্দে ভেসে এলো তাকে বলি য়ুরোপের এক নব যুগ। তার কারণ

এ নয়, সে-দিন ফ্রান্সে যারা পীড়িত তারা পীড়নকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই বাধালে। তার কারণ সেই যুগের আদিতে ছিল বাণী। সে-বাণী কেবলমাত্র ফ্রান্সের আশু রাষ্ট্রিক প্রয়োজনের খাঁচায় বাঁধা খবরের কাগজের মোড়কে ঢাকা ইস্কুল বইয়ের বুলি আওড়ানো টিয়েপাখী নয়। সে ছিল মুক্তপক্ষ আকাশ-বিহারী বাণী; সকল মানুষকেই পূর্ণতর মনুষ্যত্বের দিকে সে পথ নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছিল।

একদা ইটালির উদ্বোধনের দূত ছিলেন মাট্‌সীনি, গারিবল্‌ডি। তাঁরা যে-মন্ত্রে ইটালিকে উদ্ধার করলেন সে ইটালির তৎকালীন শত্রু বিনাশের দ্রুত ফলদায়ক মারণ উচাটন পিশাচ মন্ত্র নয়, সমস্ত মানুষের নাগপাশ মোচনের সে গরুড় মন্ত্র, নারায়ণের আশীর্ব্বাদ নিয়ে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ। এইজন্যে তাকেই বলি বাণী। আঙুলের আগায় যে স্পর্শবোধ তার দ্বারা অন্ধকারে মানুষ ঘরের প্রয়োজন চালিয়ে নিতে পারে। সেই স্পর্শবোধ তারই নিজের। কিন্তু সূর্য্যের আলোতে নিখিলের যে স্পর্শবোধ আকাশে আকাশে বিস্তৃত, তা প্রত্যেক প্রয়োজনের উপযোগী অথচ প্রত্যেক প্রয়োজনের অতীত। সেই আলোকেই বলি বাণীর রূপক।

সায়ান্স এক দিন য়ুরোপে যুগান্তর এনেছিল। কেন? বস্তুজগতে শক্তির সন্ধান জানিয়েছিল ব'লে না। জগৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের অন্ধতা ঘুচিয়েছিল ব'লে। বস্তু-সত্যের বিশ্বরূপ স্বীকার করতে সে-দিন মানুষ প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়েছে। আজ সায়ান্স সেই যুগ পার ক'রে দিয়ে আর এক নবতর যুগের সম্মুখে মানুষকে দাঁড় করালে। বস্তুরাজ্যের চরমসীমানায় মূল তত্ত্বের দ্বারে তার রথ এলো। সেখানে সৃষ্টির আদি বাণী। প্রাচীন ভারতে মানুষের মন কর্ম্মকাণ্ড থেকে যেই এলো জ্ঞানকাণ্ডে, সঙ্গে সঙ্গে এলো সৃষ্টির যুগ। মানুষের আচারকে লঙ্ঘন

ক'রে আত্মাকে ডাক প'ড়লো। সেই আত্মা যন্ত্রচালিত কর্মের বাহন নয়, আপন মহিমাতে সে সৃষ্টি করে। সেই যুগে মানুষের জাগ্রত চিত্ত ব'লে উঠেছিল, চিরন্তনের মধ্যে বেঁচে ওঠাই হ'লো বেঁচে যাওয়া ; তার উল্‌টাই মহতী বিনষ্টি। সেই যুগের বাণী ছিল, "য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"

আর এক দিন ভারতে উদ্বোধনের বাণী এলো। সমস্ত মানুষকে ডাক প'ড়লো,—বিশেষ সঙ্কীর্ণ পরামর্শ নিয়ে নয়, যে মৈত্রী মুক্তির পথে নিয়ে যায় তারি বাণী নিয়ে। সেই বাণী মানুষের চিত্তকে তার সমগ্র উদ্বোধিত শক্তির যোগে বিপুল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত ক'রলে।

বাণী তাকেই বলি যা মানুষের অন্তরতম পরম অব্যক্তকে বাহিরে অভিব্যক্তির দিকে আহ্বান ক'রে আনে, যা উপস্থিত প্রত্যক্ষের চেয়ে অনাগত পূর্ণতাকে বাস্তবতর সত্য ব'লে সপ্রমাণ করে। প্রকৃতি পশুকে নিছক দিন-মজুরী ক'রতেই প্রত্যহ নিযুক্ত ক'রে রেখেছে। সৃষ্টির বাণী সেই সঙ্কীর্ণ জীবিকার জগৎ থেকে মানুষকে এমন জীবনযাত্রায় উদ্ধার ক'রে দিলে যার লক্ষ্য উপস্থিত কালকে ছাড়িয়ে যায়। মানুষের কানে এলো— টিকে থাকতে হবে, এ-কথা তোমার নয় ; তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে, সেজন্যে ম'র্‌তে যদি হয় সেও ভালো। প্রাণ যাপনের বদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে যে-আলো জ্বলে সে রাত্রির আলো, পশুদের তাতে কাজ চলে। কিন্তু মানুষ নিশাচর জীব নয়।

সমুদ্রমন্থনের দুঃসাধ্য কাজে বাণী মানুষকে ডাক দেয় তলার রত্নকে তীরে আনার কাজে। এতে ক'রে বাইরে সে যে সিদ্ধি পায় তার চেয়ে বড়ো সিদ্ধি তার অন্তরে। এ যে দেবতার কাজে সহযোগিতা। এতেই আপন প্রচ্ছন্ন দৈবশক্তির পরে মানুষের শ্রদ্ধা ঘটে। এই শ্রদ্ধাই নূতন

যুগকে মর্ত্ত্য সীমা থেকে অমর্ত্ত্যের দিকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যায়। এই শ্রদ্ধাকে নিঃসংশয় স্পষ্টভাবে দেখা যায় তাঁর মধ্যে, যাঁর আত্মা স্বচ্ছ জীবনের আকাশে মুক্ত মহিমায় প্রকাশিত। কেবলমাত্র বুদ্ধি নয়, ইচ্ছাশক্তি নয়, উদ্যম নয়, যাঁকে দেখ্‌লে বোঝা যায় বাণী তাঁর মধ্যে মুর্ত্তিমতী।

আজ এইরূপ মানুষকে যে একান্ত ইচ্ছা করি তার কারণ, চারদিকেই আজ মানুষের মধ্যে আত্ম-অবিশ্বাস প্রবল। এই আত্ম-অবিশ্বাসই আত্মঘাতী তাই রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধিই আজ আর সকল সাধনাকেই পিছনে ঠেলে ফেলেছে। মানুষ বস্তুর মুলে সত্যকে বিচার ক'রছে। এম্‌নি ক'রে সত্য যখন হয় উপলক্ষ্য, লক্ষ্য হয় আর কিছু, তখন বিষয়ের লোভ উগ্র হ'য়ে ওঠে, সে-লোভের আর তর্ সয় না। বিষয়-সিদ্ধির অধ্যবসায়ে বিষয়বুদ্ধি আপন সাধনার পথকে যতই সংক্ষিপ্ত ক'র্‌তে পারে ততই তার জিৎ। কারণ, তার পাওয়াটা হ'লো সাধনাপথের শেষপ্রান্তে। সত্যের সাধনায় সর্ব্বক্ষণেই পাওয়া। সে যেন গানের মতো, গাওয়ার অন্তে সে গান নয়, গাওয়ার সমস্তটার মধ্যেই। সে যেন ফলের সৌন্দর্য্য, গোড়া থেকেই ফুলের সৌন্দর্য্যে যার ভূমিকা। কিন্তু লোভের প্রবলতায় সত্য যখন বিষয়ের বাহন হ'য়ে উঠ্‌লো, মহেন্দ্রকে তখন উচ্চৈঃশ্রবার সহিসগিরিতে ভর্ত্তি করা হ'লো, তখন সাধনাটাকে ফাঁকি দিয়ে, সিদ্ধিকে সিঁধ কেটে নিতে ইচ্ছে করে, তাতে সত্য বিমুখ হয়, সিদ্ধি হয় বিকৃত।

সুদীর্ঘ নির্ব্বাসন ব্যাপ্ত ক'রে রামচন্দ্রের একটি সাধনা সম্পূর্ণ হ'য়েছিল। যতই দুঃখ পেয়েছেন ততই গাঢ়তর ক'রে উপলব্ধি ক'রেছেন সীতার প্রেম। তাঁর সেই উপলব্ধি নিবিড়ভাবে সার্থক হয়েছিল যেদিন প্রাণপণ যুদ্ধে সীতাকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে আন্‌লেন।

কিন্তু রাবণের চেয়ে শত্রু দেখা দিল তাঁর নিজেরই মধ্যে। রাজ্যে

ফিরে এসে রামচন্দ্র সীতার মহিমাকে রাষ্ট্রনীতির আশু প্রয়োজনে খর্ব্ব ক'রতে চাইলেন,—তাঁকে ব'ল্লেন, সর্ব্বজনসমক্ষে অগ্নিপরীক্ষার অনতিকালেই তোমার সত্যের পরিচয় দাও। কিন্তু একমুহূর্ত্তে জাদুর কৌশলে সত্যের পরীক্ষা হয় না, তার অপমান ঘটে। দশজন সত্যকে যদি না স্বীকার করে, তবে সেটা দশজনেরই দুর্ভাগ্য, সত্যকে যে সেই দশজনের ক্ষুদ্র মনের বিকৃতি অনুসারে আপনার অসম্মান করতে হবে এ যেন না ঘটে। সীতা বল্লেন, আমি মুহূর্ত্তকালের দাবী মেটাবার অসম্মান মান্‌ব না, চিরকালের মত বিদায় নেবো। রামচন্দ্র এক নিমিষে সিদ্ধি চেয়েছেন, এক মুহূর্ত্তে সীতাকে হারিয়েছেন। ইতিহাসের যে উত্তরকাণ্ডে আমরা এসেছি এই কাণ্ডে আমরা তাড়াতাড়ি দশের মন-ভোলানো সিদ্ধির লোভে সত্যকে হারাবার পালা আরম্ভ ক'রেছি।

বন্ধু ক্ষিতিমোহন সেনের দুর্লভ বাক্যরত্নের ঝুলি থেকে একদিন এক পুরাতন বাউলের গান পেয়েছিলুম। তার প্রথম পদটি মনে পড়েঃ— "নিঠুর গরজী, তুই কি মানসমুকুল ভাজ্‌বি আগুনে?" যে মানসমুকুলের বিকাশ সাধনসাপেক্ষ, দশের সাম্‌নে অগ্নিপরীক্ষায় তার পরিণত সত্যকে আশুকালের গরজে সপ্রমাণ ক'র্‌তে চাইলে আয়োজনের ধূমধাম ও উত্তেজনাটা থেকে যায়, কিন্তু তার পিছনে মানসটাই অন্তর্দ্ধান করে।

এই লোভের চাঞ্চল্যে সর্ব্বত্রই যখন সত্যের পীড়ন চ'লেছে তখন এর বিরুদ্ধে তর্ক-যুক্তিকে খাড়া ক'রে ফল নেই; মানুষকে চাই; যে মানুষ বাণীর দূত, সত্য সাধনায় সুদীর্ঘকালেও যাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না, সাধনপথের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সত্যেরই অমৃত পাথেয় যাঁকে আনন্দিত রাখে। আমরা এমন মানুষকে চাই যিনি সর্ব্বাঙ্গীণ মানুষের সমগ্রতাকে শ্রদ্ধা করেন। এ-কথা গোড়াতেই মেনে নিতে হবে, যে, বিধাতার কৃপাবশতই

সর্ব্বাঙ্গীণ মানুষটি সহজ নয়, মানুষ জটিল। তার ব্যক্তিরূপের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বহু-বিচিত্র। কোন বিশেষ অপ্রশস্ত আদর্শের মাপে ছেঁটে একঝোঁকা ভাবে তাকে অনেক দূর বাড়িয়ে তোলা চলে। মানুষের মনটাকে যদি চাপা দিই তবে চোখ বুজে গুরুবাক্য মেনে চলার ইচ্ছা তার সহজ হ'তে পারে। বুঝিয়ে বলার পরিশ্রম ও বিলম্বটাকে খাটো ক'রে দিতে পারলে মনের শক্তি বাড়ানোর চেয়ে মনের বোঝা বাড়ানো, বিদ্যালাভের পরিবর্ত্তে ডিগ্রি-লাভ সহজ হয়। জীবনযাত্রাকে উপকরণশূন্য করতে পারলে তার বহনভার ক'মে আসে। তবুও সহজের প্রলোভনে সবচেয়ে বড় কথাটা ভুললে চলবে না যে আমরা মানুষ, আমরা সহজ নই।

তিব্বতে মন্ত্রজপের ঘূর্ণিচাকা আছে। এর মধ্যে মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় ব'লেই আমাদের মনে অবজ্ঞা আসে। সত্যকার মন্ত্রজপ একটুও সহজ নয়। সেটা শুদ্ধমাত্র আচার নয়, তার সঙ্গে আছে চিত্ত, আছে ইচ্ছাশক্তির একাগ্রতা। হিতৈষী এসে বললেন, সাধারণ মানুষের চিত্ত অলস, ইচ্ছাশক্তি দুর্ব্বল, অতএব মন্ত্রজপকে সহজ করবার খাতিরে ঐ শক্ত অংশগুলো বাদ দেওয়া যাক্—কিছু না ভেবে না বুঝে শব্দ আওড়ে গেলেই সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট। সজীব ছাপাখানার মতো প্রত্যহ কাগজে হাজার বার নাম লিখ্‌লেই উদ্ধার। কিন্তু সহজ করবার মধ্যেই যদি বিশেষ গুণ থাকে তবে আরো সহজইবা না করব কেন? চিত্তের চেয়ে মুখ চলে বেগে, মুখের চেয়ে চাকা, অতএব চলুক চাকা, মরুক চিত্ত।

কিন্তু মানুষের পন্থা সম্বন্ধে যে-গুরু বলেন, "দুর্গং পথস্তৎ", তাঁকে নমস্কার করি। চরিতার্থতার পথে মানুষের সকল শক্তিকেই আমরা দাবী করবো। বহুলতা পদার্থটিই মন্দ, এই মতের খাতিরে বলা চলে

যে, ভেলা জিনিষটাই ভালো, নৌকাটা বর্জ্জনীয়। একসময়ে অত্যন্ত সাদাসিধে ভেলায় অত্যন্ত সাদাসিধে কাজ চ'ল্‌তো। কিন্তু মানুষ পার্‌লে না থাক্‌তে, কেন না সে সাদাসিধে নয়। কোন মতে. স্রোতের উপর বরাৎ দিয়ে নিজের কাজ সংক্ষেপ ক'র্‌তে তার লজ্জা। বুদ্ধি ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো, নৌকায় হাল লাগালো, দাঁড় বানালে, পাল দিলে তুলে, বাঁশের লগি আন্‌লে বেছে, গুণ টান্‌বার উপায় ক'র্‌লে, নৌকোর উপর তার কর্তৃত্ব নানাগুণে নানাদিকে বেড়ে গেলো, নৌকোর কাজও পূর্ব্বের চেয়ে হ'লো অনেক বেশী ও অনেক বিচিত্র। অর্থাৎ মানুষের তৈরী নৌকো মানব প্রকৃতির জটিলতার পরিচয়ে কেবলি এগিয়ে চ'ল্‌লো। আজ যদি বলি নৌকো ফেলে দিয়ে ভেলায় ফিরে গেলে অনেক দায় বাঁচে, তবে তার উত্তরে ব'ল্‌তে হবে, মনুষ্যত্বের দায় মানুষকে বহন করাই চাই। মানুষের বহুধা শক্তি, সেই শক্তির যোগে নিহিতার্থকে কেবলি উদ্‌ঘাটিত ক'র্‌তে হবে—মানুষ কোথাও থাম্‌তে পারে না। মানুষের পক্ষে "নাল্পে সুখমস্তি"। অধিককে বাদ দিয়ে সহজ করা মানুষের নয়, সমস্তকে নিয়ে সামঞ্জস্য করাই তার। কল-কারখানার যুগে ব্যবসা থেকে সৌন্দর্য্য-বোধকে বাদ দিয়ে জিনিষটাকে সেই পরিমাণে সহজ ক'রেছে, তাতেই মুনফার বুভুক্ষা কুশ্রীতায় দানবীয় হ'য়ে উঠ্‌লো। এ-দিকে মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল ঘানি ঢেঁকি থেকে বিজ্ঞানকে চেঁচে মুছে ফেলায় ওগুলো সহজ হ'য়েছে, সেই পরিমাণে এদের আশ্রিত জীবিকা অপটুতায় স্থাবর হ'য়ে রইলো, বাড়েও না এগিয়ে চলেও না, নড়্‌বড়্ ক'র্‌তে ক'র্‌তে কোন মতে টিকে থাকে। তারপরে মার খেয়ে মরে শক্ত হাতের থেকে। প্রকৃতি পশুকেই সহজ ক'রেছে, তারই জন্য স্বল্পতা; মানুষকে ক'রেছে জটিল, তার জন্যে পূর্ণতা। সাঁতারকে

সহজ করতে হয় বিচিত্র হাত-পা নাড়ার সামঞ্জস্য ঘটিয়ে ; হাঁটুজলে কাদা আঁকড়ে অল্প-পরিমাণে হাত-পা ছুঁড়ে নয়। ধনের আড়ম্বর থেকে গুরু আমাদের বাঁচান, দারিদ্র্যের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে ঘের দিয়ে নয়, ঐশ্বর্য্যের অপ্রমত্ত পূর্ণতায় মানুষের গৌরব-বোধকে জাগ্রত ক'রে।

এই সমস্ত কথা ভাবছি এমন সময় আমাদের ফরাসী জাহাজ এলো পণ্ডিচেরী বন্দরে। ভাঙা শরীর নিয়ে যথেষ্ট কষ্ট ক'রেই নাম্‌তে হ'লো—তা হোক্, অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম,—ইনি **আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য ক'রে চেয়েছেন, সত্য ক'রে পেয়েছেন।** সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন ব'ল্‌লে, ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বাল্‌বেন। কথা বেশি বল্‌বার সময় হাতে ছিল না। অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারি মধ্যে মনে হ'লো, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণা-শক্তি পুঞ্জিত। কোন খর-দস্তুর মতের উপদেবতার নৈবেদ্যরূপে সত্যের উপলব্ধিকে তিনি ক্লিষ্ট ও খর্ব্ব করেন নি। তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্য্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা। মধ্যযুগের খৃষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুষ্ক করাকেই চরিতার্থতা বলেন নি। আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন, যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি। পরিপূর্ণের যোগে সকলেরই মধ্যে প্রবেশাধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। আমি তাঁকে ব'লে এলুম,—আত্মার বাণী বহন ক'রে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আস্‌বেন এই অপেক্ষায় থাক্‌বো। **সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজ্‌বে, শৃণ্বন্তু বিশ্বে।**

শ্রীঅরবিন্দ

প্রথম তপোবনে শকুন্তলার উদ্বোধন হ'য়েছিল যৌবনের অভিঘাতে প্রাণের চাঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনে তাঁর বিকাশ হ'য়েছিল আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

আজ তাঁকে দেখ্‌লুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায়—আজও তাঁকে মনে মনে ব'লে এলুম—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।"

শান্তিলি জাহাজ—২৯ মে, ১৯২৮

১৩

উপসংহার

কর্ম্মযোগী—ধ্যানযোগী শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা বিবৃত হইল। যে-জীবন পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে অনুপ্রাণিত ছিল, কর্ম্মযোগে তাহার অভ্যুদয়, আর পরিণতি তাহার প্রাচ্য-লব্ধ ধ্যান-সাধনায়। বহির্মুখী মানস আজ অন্তর্মুখী সাধনে নিমগ্ন হইয়াছে।

তাঁহার সাধন-ক্ষেত্র আজ পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত। চিন্তাশীল, কৃষ্টিপ্রার্থী নরনারী পৃথিবীর নানাদেশ হইতে আসিয়া তাঁহার আশ্রমে সমবেত হইতেছেন। শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচারীর আশ্রমের সাধনার দিকে চাহিয়া জগৎ যেন আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে!

পাশ্চাত্যের বিপুল কর্ম্মশক্তি, অসীম কর্ম্মকুশলতা; পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সারা বিশ্বে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। তাহাদের কর্ম্ম-প্রেরণা, কর্ম্মশক্তি তাহাদের ভোগবিলাসকে শেষ সীমা স্পর্শ করাইয়াছে। কিন্তু শান্তি নাই। শান্তির জন্য সকল বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। পাশ্চাত্যও তাই আজ শিক্ষার্থী, প্রাচ্যের দিকে চাহিয়া আছে—তাই বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর নিকট তাহারা তত্ত্বজিজ্ঞাসু।

যুগে যুগে মানব-সমাজের প্রয়োজনের কালে, সভ্যতার গ্লানি বিদূরিত করিবার জন্য ক্লিষ্ট মানব এমনি করিয়াই মহামানবকে আহ্বান করিয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীভগবান মানুষের মধ্যেই আপনাকে সঞ্চারিত করিয়াছেন, মানুষ মহামানবের—মহাপুরুষের দর্শন পাইয়াছে।

মানুষ আজ আবার ভগবানের স্মরণ লইতেছে; চারিদিকের বন্ধনে তাহার জীবন এই চরম বেগের মধ্যেও নিশ্চল। এই নিশ্চল জীবনকে সহজ, সরল ও নির্ম্মল না করিলে বুঝি এ-সভ্যতা ধ্বংস হয়।—

শ্রীঅরবিন্দ সাধনায় নিমগ্ন। কে বলিতে পারে শ্রীভগবান কোন সাধকের মধ্যে নিজকে প্রচারিত করিয়া জগতের গ্লানি মোচন করিবেন!

১৪

পরিশিষ্ট

শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম *

আশ্রম অর্থ গুরু বা অধ্যাত্মবিদ্যাদাতা আচার্য্যের গৃহ—যেখানে তিনি তাঁহার নিকট শিক্ষা ও যোগাভ্যাসের জন্য আগত শিষ্যদিগকে শিক্ষা দেন ও থাকিতে দেন। আশ্রম কথাটির দ্বারা কোন সঙ্ঘ বা ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বা মঠকে বুঝায় না।

আশ্রমের সব-কিছুই গুরুর—তিনিই সেখানে সর্ব্বময় কর্ত্তা। যে-সাধকেরা সেখানে থাকিয়া যোগাভ্যাস করেন তাঁহাদের কোন বিষয়ে কোন দাবি, স্বত্ব বা মত-প্রকাশের অধিকার নাই। গুরুর ইচ্ছার উপরই তাঁহাদের সেখানে থাকা বা না-থাকা নির্ভর করে। তিনি যে টাকা-কড়ি পান তাহা তাঁহারই—সাধারণের কোন সমবায়ের (public body) নহে। উহা কোনরূপ যৌথ-ন্যাস (Trust) বা বিশেষ উদ্দেশ্যে রক্ষিত ধন-ভাণ্ডারও (Fund) নয়, কারণ এখানে সাধারণের কোন প্রকারের কোন প্রতিষ্ঠানই নাই। এইরূপ আশ্রম খৃষ্টের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে ছিল এবং এখনও বহু সংখ্যক আছে। ইহার সবই গুরুর উপর নির্ভর করে এবং তাঁহার স্থান পূরণে সমর্থ অন্য কোন গুরু না মিলিলে প্রথমোক্ত গুরুর জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই আশ্রমের অবসান হয়।

* শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচারী আশ্রম কর্ত্তৃক সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত বিবৃতির অংশ-বিশেষের মর্ম্মানুবাদ।

পণ্ডিচারীর আশ্রমটি এই প্রকারে সৃষ্ট হইয়াছে—প্রথমে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচারীতে তাঁহার গৃহে অল্প কয়েকজনকে সঙ্গে করিয়া বাস করিতেন—পরে ক্রমশঃ আরও কয়েকজন আসিয়া জুটিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দের সহিত যোগদান করেন। তাহার পর হইতে আশ্রমের জনসংখ্যা এমন বাড়িতে লাগিল যে, তাঁহাদের বাসের জন্য আরও বাড়ী কিনিতে ও ভাড়া করিতে হইল। বাড়ীগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও পুনর্নির্ম্মাণ—খাদ্য-সামগ্রী সরবরাহ—এবং সুষ্ঠু ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে বসবাসের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও করিতে হইল। এ-সকলই শ্রীমা কৃত ঘরোয়া বিধি-ব্যবস্থা; প্রয়োজন বোধ করিলে তিনি ইহা ইচ্ছানুরূপ পরিবর্দ্ধন, পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন করিতে পারেন—ইহার কিছুই সর্ব্ব-সাধারণের জন্য নহে।

আশ্রমের বাড়ীগুলি হয় শ্রীঅরবিন্দের, নয় শ্রীমায়ের সম্পত্তি। সেখানে যে-টাকা খরচ হয় তাহাও শ্রীঅরবিন্দের বা শ্রীমায়ের। শ্রীঅরবিন্দের কাজে সাহায্য করিবার জন্য অনেকে টাকা দিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা একান্তভাবে শ্রীঅরবিন্দ বা শ্রীমাকেই দেন—সাধারণের প্রতিষ্ঠান রূপে আশ্রমকে দেন না এবং আশ্রমটিও সাধারণের কোন প্রতিষ্ঠান নয়।

আশ্রমটি একটি সঙ্ঘ বা সমিতিও নয়—ইহা কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী গঠিতও হয় নাই—ইহার কোন কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা, কর্ম্মচারী, সাধারণ সম্পত্তিও নাই—সর্ব্ব-সাধারণের কোন কাজের সহিতও ইহার কোন সংশ্রব নাই।

আশ্রমটি কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও নয়। আশ্রমবাসিগণ আশ্রমে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই রাজনীতির সহিত সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ

করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ধর্ম্ম-বিষয়ক, রাজনৈতিক বা সামাজিক—সকল প্রকার প্রচার-কার্য্যই নিষিদ্ধ।

আশ্রমটি কোনরূপ ধর্ম্ম-মণ্ডলীও নয়। সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকই এখানে আছেন—এবং এমন লোকও আছেন যাঁহারা কোন বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বী নহেন। এখানে নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মমত বা বিধি-নিষেধের (creed or set of dogmas) কড়াকড়ি নাই, কোন শাসক ধর্ম্ম-মণ্ডলীও (governing religious body) নাই; শ্রীঅরবিন্দ প্রদত্ত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মনঃসংযম, ধ্যান ইত্যাদি কতকগুলি মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে—যাহার উদ্দেশ্য চেতনা সম্প্রসারণ (enlarging of the consciousness), সত্য গ্রহণ ও মনন (receptivity to the Truth), কামনা জয়, অন্তরস্থ প্রচ্ছন্ন ভাগবত সত্তা ও চেতনা আবিষ্কার, উচ্চতর স্তরে মানব-প্রকৃতির বিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশ।